ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত

ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত

ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

প্রথম প্রকাশ : রাখিপূর্ণিমা ১৩৬৪

প্রকাশক : রথীন্দ্রকুমার পালিত, পাব্লিকেশন্‌স্ অফিসার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক : মৃদুলকান্তি সেন, সহ-অধীক্ষক
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস

পিতৃদেব
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের
পুণ্যনামে উৎসর্গীকৃত

ভূমিকা

বর্তমান ভারতবর্ষের প্রথিতযশা দার্শনিক অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য ১৯৭৪-এ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষেত্রনাথ বেদান্ত বক্তৃতা ও সনৎকুমার রায়চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা দেন। এই দুটি বক্তৃতামালার বিষয় ছিল বর্তমান গ্রন্থের বিষয়। গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হবার প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু নানা কারণে বইটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। তবু, বিলম্ব সত্ত্বেও বইটিকে সুধীজনের সামনে তুলে ধরতে পারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, প্রকাশনা বিভাগ এবং বিশেষ করে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক-গবেষিকা সকলেই গর্বিত ও সুখী।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর দর্শন-চর্চায় একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তা হল দার্শনিক অনেকান্তবাদ। তাঁর মতে, অনেকান্ত দার্শনিক যে কোন মৌল মতবাদকে সমানভাবে গ্রহণ করতে পারেন। এই অনেকান্ত-তত্ত্বকে বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি নতুনভাবে তা উপলব্ধি করতে চাইছেন। 'বেদান্ত' অর্থে তিনি বিভিন্ন বেদান্তের যা সাধারণ বক্তব্য, তাই বুঝতে চেয়েছেন। তা হল, 'একে'র উপলব্ধি এবং এই 'একে'র দৃষ্টিতে 'বহু'র যথার্থ মর্যাদা নির্ধারণ। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি আলোচনা করে দেখিয়েছেন, ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবন ও তার আধ্যাত্মিক মনোভাব অনেকাংশেই বেদান্ত-মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। অন্য যে সব মতবাদ আছে, সেগুলিও যে যে অংশে বেদান্তের সামিল, সেই অংশে ভারতবাসীর জীবনকে প্রভাবিত করেছে। বেদান্তের যে প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়, তা হল ভারতবাসীর উদারতম দৃষ্টিভঙ্গী এবং অসাধারণ পরমতসহিষ্ণুতা। এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিমূল অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে বৈদান্তিক নিত্যাস্থির 'একে'র প্রতি অবিচলিত আস্থায়। ভারতবাসী এই 'একে'র সূত্রে পরিবর্তনশীল জগদ্বৈচিত্র্যকে নিত্যাবিধৃতরূপে দেখতে চায়।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য যুক্তির সাহায্যে তাঁর অনেকান্তবাদ স্থাপন করতে চান। তাই প্রথমে তিনি দর্শনে যুক্তির স্থান আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'বুদ্ধি' বলতে বোঝায় সেই বৃত্তি যার ইংরেজী নাম reason or thinking। প্রশ্ন হচ্ছে, 'বুদ্ধি' দ্বারা নতুন কোন জিনিষ জানা যায়

কিনা। অনেক দার্শনিক বলেন, বুদ্ধির কাজ হলো কতকগুলি কাঠামো তৈরী করা, যার মধ্যে প্রত্যক্ষে পাওয়া জিনিষগুলিকে একটা ছাঁচে আনা যায় এবং এর ফলে অজানা জিনিষ সম্বন্ধে একটা সামান্যতঃ-জ্ঞান পাওয়া যায়। কিন্তু সামান্যতঃ-ধারণা কোন নতুন জ্ঞান নয়। কিন্তু বুদ্ধি যে 'মডেল' গড়ে, তা কোন শূন্য থেকে পাওয়া নয়। যদি যাবতীয় সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক জিনিষ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখাতেই 'মডেলে'র সার্থকতা, তাহলে 'মডেল' গড়ার আগে প্রাকৃত জীবনের কিছুটা বোধ থাকা দরকার। অনেকে মনে করেন, আসলে মৌল 'মডেল' প্রাকৃত জীবনের অন্তস্তলবর্তী নয়, তা শাশ্বত অধ্যাত্ম জগতের ব্যাপার এবং এক জাতীয় অতি-প্রাকৃত প্রত্যক্ষের বিষয়। হয়ত এরই মধ্যে বুদ্ধির আসল রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু যে প্রাকৃত বস্তু বুদ্ধির উপজীব্য, তা কি? কোন জিনিষকে যখন আমরা পাই, তখন এই ভাবে পাই যে তা একটা চেয়ার বা টেবিল বা মানুষ। কিন্তু আসলে তা একসঙ্গে গলে-মিশে একাকার হয়ে থাকা অনেক কিছু। বুদ্ধির বিশ্লেষণ বা পুনর্দৃষ্টির (reflection) ফলে বিভিন্ন জিনিষগুলি আলাদাভাবে ধরা পড়ে। তাই যাকে আমরা পাওয়া জিনিষ বা datum বলতে চাই, তা এক ধরণের প্রাথমিক সমগ্র। এবং তা আর কিছু নয়, আমার সামগ্রিক জীবন। তাই যে কাঠামো বা form নিয়ে বুদ্ধির কারবার, তা ঐ সামগ্রিক জীবনের মধ্যে ছিল এবং তা পাওয়া গেছে, 'পুনর্দর্শনের' ফলে। তাহলে একথা কেন বলা হয়, মৌলতম মডেল এবং যে বুদ্ধি তা তৈরী করে, উভয়েই অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য মনে করেন, 'মানুষ' প্রকৃতি-রাজ্যের বাসিন্দা হয়েও সমগ্র প্রকৃতির বাইরে দাঁড়াতে পারে। মানুষের এই স্বাতন্ত্র্যের বোধ তার বুদ্ধিতেই সবচেয়ে পরিস্ফুট। তবু তা স্বাতন্ত্র্য-বোধ, স্বপ্রকাশ স্বাতন্ত্র্য নয়, কারণ বুদ্ধি প্রকৃতির কার্য-কারণ নিয়ম-মুক্ত নয়। কিন্তু যাকে আমরা স্বাতন্ত্র্য বলতে চাই, তা বুদ্ধিরও ওপারে, এবং বেদান্তের মতে, তা শাশ্বত, সত্য, অক্ষয়, অব্যয়, যার অপর নাম নিষ্কলুষ সচ্চিদানন্দ।

অনেকের মতে, এই হল পরম পুরুষার্থ, যেখানে 'তুমি-আমি'র ভেদ থাকবে না, থাকবে শুধু এক 'মহা-আমি'। প্রাকৃত সুখ না থাকলেও থাকবে ব্রহ্ম-লাভ স্বরূপ ভূমানন্দ। মোটামুটি ভাবে এই হল শাঙ্কর অদ্বৈত বেদান্তের মত। অনেকের মতে, এই রাজ্যে মানুষ তার ব্যক্তিত্ব হারায় না, পরিশোধিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-ভক্তিযুক্ত হয়ে সাদৃশ্য, স্বালোক্য, সামীপ্যাদি প্রাপ্ত হয়। কেউ আবার 'শুদ্ধাশুদ্ধ' ও 'শুদ্ধ' দুই অধ্যাত্ম রাজ্য মানেন, এবং 'শুদ্ধ' রাজ্যে খাঁটি সাত্ত্বিক অহংই ঈশ্বর এই

বোধের কথাও বলেন। 'শুদ্ধ' রাজ্যের বাইরে চরম শিব-শক্তির তত্ত্বেই ব্যক্তি-অহংএর অবসানের কথা এ'রা বলেন। কেউ আবার শুদ্ধাশুদ্ধের পরেই পরম পুরুষার্থের স্থান নির্দেশ করেন। এই মতগুলি বিভিন্ন প্রকার বৈষ্ণব ও শৈব মতবাদ—আসলে বেদান্তেরই বিভিন্ন প্রকার।

অন্য মতবাদীরা আছেন যাঁরা প্রকৃতি রাজ্যের বাইরে স্বাতন্ত্র্য মানেন না এবং জ্ঞান ও কৃতিতে স্বাতন্ত্র্যকে ব্যবহার করে তাঁরা মৈত্রী, করুণা, প্রেম ইত্যাদি লাভ করতে চান। সাধারণভাবে এই মতকে বৌদ্ধ মতবাদ বলা যায়। অন্যেরা মনে করেন, বিশ্ববিবর্তনের পথে মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যরূপ অভিনবত্ব ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁদের মতে, স্বাতন্ত্র্যের কাজ হল জড়-জগতকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুসমঞ্জস করে নেওয়া, যাতে মানুষের জীবন সুচারুরূপে গড়ে উঠতে পারে। মার্ক্সীয় জড়বাদীরা এই রকম বলেন। এ'দের মত প্রাচীন জড়বাদীদের থেকে আলাদা, কারণ প্রাচীন মত, স্বাতন্ত্র্যকে অবভাস মাত্র মনে করে আর এ'রা স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে চান, যা প্রকৃতির সঙ্গে দ্বান্দ্বিক গতিতে নিজেকে প্রকাশ করেছে।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলতে চান, মানুষের এই স্বাতন্ত্র্য-স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-বোধরূপ বুদ্ধিই দেখিয়ে দেয়, যেমন মেঘের চারপাশে সোনালী আভা, কিছুটা অস্পষ্ট হলেও সরাসরি সূর্যকে দেখিয়ে দেয়। তবে বুদ্ধির নীচের স্তরে এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ চিত্তমালিন্যের প্রভাবে, নানাবিধ সঙ্কীর্ণ জৈব স্বার্থের চাপে, চাপা পড়ে থাকে। চিত্ত যত নির্মল হয়, স্বার্থবুদ্ধি যত কমে আসে, স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ততই প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। নিরবশেষ চিত্তশুদ্ধি অর্জনই খাঁটি আধ্যাত্মিকতা লাভের একমাত্র উপায়।

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব নিয়ে যে মতবাদগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলিকে এক একটি একান্ত দর্শন বলা যায়। তাদের মোটামুটি ভাগ এই :

(১) একদল ; যেমন জড়বাদ অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিকতা মানে না। তবে প্রাচীন জড়বাদ এর আলাদা অস্তিত্ব না মানতে চাইলেও নব্য জড়বাদ স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে না। তৃতীয় একদল আছেন যাঁরা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মাথা ঘামান না। এই দলেই empiricist-রা পড়েন।

(২) অধ্যাত্মবাদীরা মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন, যা প্রকৃতি রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। এ'দের চারভাগে ভাগ করা যায়। (ক) একদল স্বাতন্ত্র্যকে কোন বস্তু বলে স্বীকার করতে চান না, যদিও তা অস্বীকৃত নয়। এ'দের মতে, স্বাতন্ত্র্যকে ব্যবহার করতে হয়। (খ) দ্বিতীয় দলের মতে, স্বাতন্ত্র্য একটা পৃথক অতিপ্রাকৃত জগৎ। মানুষের পরম পুরুষার্থ হল এই

জগত-স্থ হওয়া। মানুষ যখন এই জগতে উত্তীর্ণ হয়, তখন সে দেখে, আমি-তুমি, বা আমি-জগৎ-এ কোন ভেদ নেই। সব নির্বিশেষ স্বাতন্ত্র্য-মাত্র, যার শাস্ত্রীয় নাম 'ব্রহ্ম'। এটি হল শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত মত। (গ) আর একটি মত আছে, যে মতে স্বাতন্ত্র্য দ্বিমূর্তিক। অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রধানতঃ আমি-রূপ ব্যক্তি বিশেষের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হয়, কিন্তু তার নিত্যসহভাবী রূপে আর এক মহাস্বাতন্ত্র্যও উপলব্ধ হয়, যার নাম ঈশ্বর। প্রতিটি শুদ্ধ আত্মা ও মহান আত্মার মধ্যে একজাতীয় প্রায়-একত্ব সম্বন্ধ থাকে এবং শুদ্ধ আত্মাদের নিজেদের মধ্যে কিছুটা পৃথক ধরণের প্রায়-একত্ব থাকে। এরই নাম 'অপৃথকসিদ্ধি' এবং সাধারণরূপে তাকে ভক্তি বা প্রেম বলা যায়। বৈষ্ণব দার্শনিকরা মোটামুটি এই মতাবলম্বী। (ঘ) আর একদল অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে প্রাকৃত জগতের এক প্রকার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বলেন, প্রাকৃত জগৎ মিথ্যা নয়, অতি-প্রাকৃত জগতে চরম তত্ত্ব যে ব্রহ্ম, তিনি তাঁর একাত্মভূত অথচ তাঁর থেকে কিছুটা ভিন্ন শক্তি দ্বারা, ঈশ্বররূপ ধারণ করে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এঁদের মতে, ব্রহ্মের সঙ্গে এই শক্তির ঐকাত্ম্য দাবি নিরবশেষ ঐক্যের দাবি নয়। ঐক্য সেখানে পিতা-পুত্রের, আত্মা-দেহের, বিশেষ্য-বিশেষণের মত, যেখানে ভেদ অস্বীকৃত নয়। যা 'এক' তা সব ভেদকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছে, স্বাতন্ত্র্যের চরম বোধে এই সত্যটা ধরা পড়ে এবং যারা একসূত্রে গ্রথিত, তাদেরও বোঝা যায়। ভেদাভেদবাদীদের মতে, চরম ভেদাভেদ এক অবিশ্লেষ্য সত্য, তবে ভেদাভেদের সাক্ষাৎ প্রতীতিতে অবিভাজ্য একটি বোধ থাকে যে-বোধে ভেদ ও অভেদ পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়েও বিলীন নয়। এই বোধের নামই ভক্তি বা প্রেম। আর একটি দল বলে, ব্রহ্মকে স্বরূপেও ধরা যায়, অথচ স্বরূপে ধরা কালেই দেখতে পাওয়া যায়, তিনি ভেদপ্রসূ-ও বটে। এই বিভিন্ন মতের মধ্যে প্রথম দুইদল বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে মূলতঃ ভক্তির দিক থেকে দেখেন, শেষ দল জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে চান।

চতুর্থ একটি বিরাট উপদল আছে, যে দলের দার্শনিকরা বলেন, পূর্ণব্রহ্ম তো কেবল নিজ সত্তাবান নন, সদাশিব হয়েও তিনি ঈশ্বররূপে জগৎ ও জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি দেহ-মন-ধারী জীব সৃষ্টির পূর্বে কেবল মন-ধারী ও তার আগে কেবল-ব্যক্তিত্ব-ধারী শুদ্ধ আত্মা সৃষ্টি করেন। এই সব শুদ্ধ আত্মা তাঁরই মহাস্বাতন্ত্র্যের অংশ। কিন্তু মনে রাখতে হবে কলসের জল যেমন মহাসমুদ্রের জল থেকে ভিন্ন নয়, সেরকম স্বতন্ত্র সত্তাও মহাস্বাতন্ত্র্য থেকে আলাদা নয়। তবে মহাজলও যেমন সত্য,

অংশগুলিও তেমন সত্য। এই দল বলতে চান, পরম ব্রহ্ম স্ব-স্বভাবেই নিজ অংশাবলীর যথার্থ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেন, আপনাকে বহুরূপে সত্য সত্যই দাঁড় করান।

যে সব মৌল মতবাদের কথা বলা হয়েছে, অধ্যাপক ভট্টাচার্য মনে করেন, তারা প্রত্যেকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং নিজ নিজ পরিধির মধ্যে সুসমঞ্জস। তিনি বলতে চান, যদি এমন হয় যে জীবন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দেখা যায় আমার মৌল দৃষ্টি ও মৌল ভিত্তির সামনে আরও কয়েকটি মৌল দৃষ্টি ও মৌল ভিত্তি আছে, যেগুলি সমবলবান, যাদের বিনাশ সম্ভব নয়, যেগুলি এড়ান সম্ভব নয় এবং বিস্তৃততর অন্য এক ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, সেখানে প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানই একমাত্র পথ। এই পথ গ্রহণ করার অর্থই হল এটা স্বীকার করা যে প্রতিটি মতই গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন মৌল মতবাদের প্রত্যেকটিই যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে আমি একটিমাত্র গ্রহণ করি কেন? আসলে, একটি মতবাদ আমরা পাই আমাদের সমাজ ও সম্প্রদায় থেকে; মতবাদ যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়নি।

চরম সত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেন, "চরম সত্য বহুমুখী—সহস্রশীর্ষ ও সহস্রপাদ। কিন্তু প্রতিটি মুখ, প্রতিটি শীর্ষ ও প্রতিটি পদ স্বগৌরবে গরীয়ান, কেউ অন্যের অপেক্ষা রাখে না।" আমার বাছাই করা নির্দিষ্ট সত্যস্বরূপটি আমি গ্রহণ করলেও বৈকল্পিকভাবে আমি অন্য সত্যগুলি গ্রহণ করতে পারি। এই ভাবে এক সত্য থেকে অন্যে সত্যে অতিক্রমণ, এতে প্রত্যেক সত্য স্বরূপেরই স্বীকৃতগ্রহণ হয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন, এ একপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন দোলাচাল খেলা। বিশ্বভ্রমী সত্যান্বেষী পুরুষ এই দোলাচলবৃত্তি অবলম্বন করে এক সত্য থেকে সত্যান্তরে নিরন্তর পরিভ্রমণ করেন।

যে সমস্ত মৌলিক মতবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের বেলায় কি করে অনেকান্ততা সম্ভব? প্রাচীন জড়বাদীরা আধ্যাত্মিকতাকে ছায়ামাত্র মনে করলেও নব্য জড়বাদীরা ছায়ার সূত্র ধরে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। প্রাচীন মতবাদীও একেবারে আধ্যাত্মিকতাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, তা নয়, কারণ তিনি তার ব্যবহার করেন। অবশ্য নব্য জড়বাদীরা বলবেন, আধ্যাত্মিকতায় অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। তবু এই আধ্যাত্মিকতার প্রভাব যে জীবনে রয়েছে, একথা তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। শুধু বলেন, এক আদর্শ মানবিক পরিবেশে আধ্যাত্মিকতার এই অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব মানুষের জীবনে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কোন কোন

দার্শনিক এই অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হয়ে তার রূপটিকে উপলব্ধি করেন। এ'রাই অধ্যাত্মবাদী। অধ্যাত্মবাদীদের একদল অবশ্য আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যকে ব্যবহারাত্মক বলে মনে করেন। আধ্যাত্মিকতা হয়ে দাঁড়ায় এক প্রকার সংস্কার বা দৃষ্টি, যা দিয়ে প্রাকৃত জগতকে নতুন করে গড়া হয়। এই দার্শনিকরা স্বাতন্ত্র্যকে ব্যবহারাত্মক বললেও, কেউ কেউ যেমন যোগাচারী বৌদ্ধরা, এই স্বাতন্ত্র্যকে স্বরূপেও ধরা যায়, একথা স্বীকার করেছেন। ভারতীয় দর্শনের অন্য মতবাদীরা যেমন বেদান্ত সম্প্রদায় এবং অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক অধ্যাত্ম জগতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছেন। অদ্বৈত বেদান্তীর কাছে নির্বিশেষ বস্তুসৎ স্বাতন্ত্র্যস্বরূপই একমাত্র সত্য। তিনি আর কিছুই দেখেন না, কিছুই শোনেন না—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। কিন্তু অন্য বেদান্তীরা অধ্যাত্মরাজ্যে আরও অনেক তত্ত্ব পেয়েছেন, কেউ কেউ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও সহভাবীরূপে এক মহাস্বাতন্ত্র্যের সন্ধান পেয়েছেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলতে চান, যে কোন চরম সত্য লাভই পরম পুরুষার্থ। পরম পুরুষার্থ লাভ যদি পরম আনন্দ হয় তাহলে, "পূর্ণতা-লাভ হল একাধিক পরমানন্দে দোল-খাওয়া রূপ 'অতিরিক্ত' এক আনন্দ"। বিশ্বদোলে দোল খেতে খেতে এই স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ সত্য একবার সব কটি চরম সত্য স্পর্শ করে যায়, আবার নীচের দিকে নামবার সময় সেগুলি যে শুধু দ্বিতীয় বার স্পর্শ করে তা নয়, প্রাকৃত জগতের প্রতিটি বিন্দুও স্পর্শ করে এবং সর্বনিম্নে নেমে এসে আবার ঊর্ধ্ব দোলে সেই বিন্দুগুলি দ্বিতীয় বার স্পর্শ করে, আর অধ্যাত্ম জগতের প্রতিটি চরম সত্যে আবার তৃতীয় বারের জন্য স্পর্শ সুখ পায়। এই ভাবে নিরন্তর বিশ্বদোল খাওয়া চলে। এর ফলে যে নতুন তত্ত্ব পাওয়া যায় তা হল বিশ্বদোলে দোল। বিশ্বদোলবাদী বলেন, সব মৌলিক মতবাদই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য এই কথা বলে শেষ করেছেন, বিশ্বদোল চরম-সত্য-রাজ্যের নিগূঢ় মাত্রা (dimension) বিশেষ।

আমি অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্যের 'অনেকান্ত-বেদান্ত' তত্ত্ব সংক্ষেপে বহুলাংশে তাঁরই ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করবার চেষ্টা করেছি। উদ্দেশ্য, যাঁরা এই গ্রন্থ পড়বেন, এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হয়ত তাঁদের সাহায্য করবে। তবে, যতটা স্পষ্ট করে বক্তব্যগুলি তুলে ধরার দরকার, অল্প পরিসরে তা করা সম্ভব হয়নি। আশা করি যাঁরা এই বইটি পড়বেন, তাঁরা এটা মনে রাখবেন এবং যদি বিবৃতিতে আমার অজ্ঞানতা-জনিত ভুল-ত্রুটী হয়ে থাকে, আশা করব তাঁরা সেটাও ক্ষমা করবেন।

এই বইটি প্রকাশের জন্য যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকেই দর্শন বিভাগের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে, প্রকাশন অধিকর্তা শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত, তাঁর বিভাগের কর্মীরা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের কর্মীরা এই বই প্রকাশের জন্য সবিশেষ যত্ন না নিলে বইটি হয়ত অন্ধকারেই থেকে যেত। এ'দের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

(ক) উপক্রমণিকা

ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে এবং তার আধ্যাত্মিক মনোভাবে বেদান্তের প্রভাব যে গভীর-প্রবিষ্ট, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঠিক কতটা প্রভাব কী আকারে কোন্‌খানে সক্রিয় তা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, বহু কদর্থের সম্ভাবনা থেকে যায়।

আমাদের সামাজিক ও অধ্যাত্ম জীবনে যে অপূর্ব বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই চোখে পড়ে সেটি হল সুদূর অতীত কাল থেকেই এ-দেশে নানা বিসদৃশ, এমন কি পরস্পর-বিরুদ্ধ, নানা মতাদর্শের, নানা সামাজিক ও অধ্যাত্ম ধর্মের[১], প্রায়-নির্বিবাদ সহাবস্থান। যৌক্তিক বিচার বা বাদবিতণ্ডা কালে আমরা একে অপরের মতবাদ নির্মম ভাবে খণ্ডন করেছি, প্রয়োজনবোধে কটূক্তিও করেছি, কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে কেবল মতবৈচিত্র্যের কারণে হানাহানি করতে চাই নি; সাধারণতঃ করিও নি। বহিরাগত অনেক জাতি অনেক সময়ে বাহুবলে এ-দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভারতবাসীকেও অনেক সময়ে বাহুবলে এদের প্রতিরোধ করতে হয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীর স্বভাবসিদ্ধ উদারতার ফলে ঐ-সব জাতি, ঐ-সব মতাদর্শ অনতিবিলম্বেই বহুসম্মত ভারতীয় জীবনধারার অঙ্গীভূত

১। অন্য দেশে 'religion' বা তার সমার্থক শব্দ যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের দেশে ব্যবহৃত 'ধর্ম' শব্দের অর্থ তার চেয়ে অনেক ব্যাপক। আধ্যাত্মিক মাত্রা (Spiritual dimension) —অর্থাৎ religion-এর ছোঁয়াচ না থাকলেও শাস্ত্রসম্মত ব্যক্তিগত বা সমাজগত আচার-অনুষ্ঠানকেও আমরা 'ধর্ম' বলি; শুধু তাই নয়, এই অর্থেই 'ধর্ম'-শব্দের বহুলতর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

হয়ে গেছে, এবং ভারতীয় সংস্কৃতিও ফুলে ফলে যথাযথ পরিপুষ্টি লাভ করেছে।[২]

এই যে অপূর্ব উদারতা, এই যে অন্যত্র-অদৃষ্ট প্রসন্ন পরমতসহিষ্ণুতা—এটাই হল ভারতীয় জীবনের আসল বৈদান্তিক ভিত্তি। সকল জীবই নারায়ণের অংশ, সর্বত্রই ব্রহ্মের প্রকাশ, মূলে সবই এক, জগদ্বৈচিত্র্য মহামায়ার অচিন্ত্য লীলাপ্রকাশ; অতএব সব বৈচিত্র্যের মূলে যে মহান্ ঐক্য বর্তমান তার যথাসম্ভব আঁচ পাওয়া এবং ঐ ঐক্যসূত্রেই যে যাবৎ বৈচিত্র্য বিধৃত, এ-কথা উপলব্ধি করাই হল মানবজীবনের মুখ্য লক্ষ্য। বেদান্তের এই সার কথাগুলি ভারতবাসী মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে, এবং তারই ফলে সে এই উদার মনোভাব গ'ড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে যে, সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে যে-কেউ যে-কোন কথা বলে তা অংশতঃ সত্য হতে বাধ্য এবং সদ্বুদ্ধিচালিত হয়ে যে-কেউ, বা যে-কোন জাতি, যে-ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তা যথাযথ অংশে ধর্মসম্মত হতে বাধ্য। ভারতবাসী মনেপ্রাণে কামনা করে যে, লোকে যেন এই সব বিচিত্র মতবাদ ও বিভিন্ন জীবনধারা 'যার যেথা স্থানে' যথাযথ সাজিয়ে গভীর ভাবে বোঝবার চেষ্টা করে। এইজন্যই ভারতীয় দার্শনিক পরমতবিচার কালে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষীর স্বপক্ষে যথাসম্ভব সদ্‌যুক্তি সংগ্রহ করেন। ভারতবাসীর মতে নিছক মিথ্যাবাদী ও কপট মিথ্যাচারী ছাড়া আর সকলেরই বক্তব্য স্থির ভাবে শোনা উচিত, এবং সব জীবনযাত্রা প্রণালীতেই সত্য কতখানি তার অনুসন্ধান করা উচিত। এই তো বেদান্তের দৃষ্টি। এই বেদান্তদৃষ্টি ভারতবাসীর মজ্জাগত। ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রভাব প্রসঙ্গে এর অতিরিক্ত যা-কিছু বলা হয় তা হয় অতিরঞ্জিত, না-হয় অস্পষ্ট, না-হয় সরাসরি মিথ্যা কথা। কেন অতিরঞ্জিত, অস্পষ্ট বা মিথ্যা তা কয়েকটি সম্ভাব্য আপত্তির উত্তর প্রসঙ্গে দেখান যায়।

প্রথম আপত্তি : অনেকেই আপত্তি জানিয়ে বলবেন যে, বেদান্তের

২। মতবাদের কারণে হানাহানি না ঘটলেও রাজ্যবিস্তার, প্রতিপত্তিবিস্তার ও অন্যান্য রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে পারস্পরিক হানাহানি চিরকালই ঘটে এসেছে। পরবর্তী যুগে আবার অনেক সময়ে ঐ-সব বিজাতীয় কারণের সঙ্গে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মতবাদ নিছক অনুষঙ্গ দোষে জড়িত হয়ে গেছে। কিন্তু অবিমিশ্র সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মতবাদের তাগিদে ভারতবাসী কস্মিন কালেও হানাহানি করে নি।

প্রভাব কেবল এ-টুকু নয় এবং এটা আসল প্রভাবও নয়। তাঁদের মতে ভারতবাসীর জীবনে বেদান্তের আসল প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার অস্বাভাবিক জগৎ-বিমুখতায়, জাগতিক অভ্যুদয়ের তুলনায় আধ্যাত্মিক কল্যাণের স্থান অনেক উর্ধ্বে নির্দিষ্ট করায়। জাগতিক অভ্যুদয়ের প্রতি এই অস্বাভাবিক বিরূপতার ফলেই তার যত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাধারণভাবে চারিত্রিক অধঃপতন। শুধু তাই নয়, দূরস্থ আধ্যাত্মিকতার প্রতি তার আস্থা এত অত্যধিক যে, অবাঞ্ছিত বোধ করলে সে অতি-সন্নিহিত রূঢ় জাগতিক সত্যকেও নির্দ্বিধায় অস্বীকার করতে পারে; আর কিছু না হোক, কর্মফলের দোহাই দিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখতে পারে। এঁদের মতে এ-সমস্তই হল তার বেদান্তীয় ঐতিহ্য। বেদান্তভিত্তিক যে-উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার গুণগান করা হয় সেটা এঁদের মতে প্রকারান্তরে ভীরুতা ও দুর্বলতা—পলায়নপরমনোবৃত্তির বেনামী কারবার।

প্রথম আপত্তির উত্তর : ভারতবাসীর মন জগৎ-বিমুখ হয়ে গড়ে উঠেছে, এই কথাটা বহুলাংশে অসত্য, এবং যে-অংশে সত্য তার সঙ্গে বেদান্তের কোন সম্পর্ক নেই। কথাটা অসত্য এই জন্য যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সাধারণ ভারতবাসীর এ-মনোভাব ছিল না। অন্যান্য সব জাতির মত সেও রীতিমত জাগতিক অভ্যুদয়ের অনুশীলন করেছিল, ব্যাবহারিক জগৎ-সভাতেই উচ্চ এক স্থান অধিকার করে রেখেছিল। ধর্মনিয়ন্ত্রিত অর্থকামচর্চাই ছিল বহুতম ভারতবাসীর জীবনাদর্শ।[৩] ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম ছিল নিয়ামক পুরুষার্থ মাত্র—বস্তুহীন নিয়মসর্বস্ব কোনও ধর্ম অনুশীলিতব্য ছিল না, এবং চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের সাধনা 'কোটিতে গুটিকে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মের নিয়ম্য বস্তুই ছিল অর্থ এবং কাম। ধর্মনিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ সংযত, সুষম, অ-স্বার্থৈককেন্দ্রিক অর্থকামকৃত্যই ছিল সাধারণ ভারতবাসীর দৃষ্টিতে আদর্শ জীবন। 'কোটিতে গুটিক' মহাপুরুষের খাতিরে শাস্ত্রে, অবশ্য, মোক্ষই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে পরিকীর্তিত হয়েছিল এবং মোক্ষের প্রয়োজনানুসারে তত্তৎকালিক নৈষ্কর্ম্যের গুণগান করাও হয়েছিল। কিন্তু বারে বারে সাবধানবাণীও উচ্চারিত হত : (১) মোক্ষ সকলের জন্য নয়, অতি-স্বল্পসংখ্যক উচ্চাধিকারীর জন্য এবং (২) মোক্ষচর্চার অধিকারটুকু লাভের জন্যই, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য, সংসাররূপ অর্থকাম-

৩। হয়তো বৌদ্ধসংস্কৃতির শেষ দিকে সাময়িক ভাবে এই ভাবটা হ্রাস পেয়েছিল।

রাজ্যেই প্রথমে শাস্ত্রবিহিত সংযমাদি অভ্যাস করতে হয়। এইজন্যই শাস্ত্রসম্মত গার্হস্থ্যজীবনের পরে বানপ্রস্থের, এবং তারও পরে যতি-জীবনের বিধান দেওয়া হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু তাঁদের ক্ষেত্রে যাঁরা জন্ম থেকেই উচ্চমার্গ-অবলম্বনের উপযোগী গুণরাজিবিভূষিত, অর্থাৎ যাঁরা পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে এই জন্মে মোক্ষসাধনের অধিকার নিয়েই এসেছেন। কোন শাস্ত্রেই সর্বসাধারণের জন্য প্রথম থেকেই সন্ন্যাস বিহিত হয় নি— এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রেও নয়, বেদান্তে তো নয়-ই। অতএব, যাঁরা বলেন বেদান্তের প্রভাবেই ভারতবাসীর মন জগৎ-বিমুখ ও পলায়নপর-মনোবৃত্তিক হয়ে গড়ে উঠেছে, তাঁরা ঠিক কথা বলেন নি।

অথচ, এ-কথাও ঠিক যে, কয়েক শতাব্দী হল ভারতবাসী ঐহিক অভ্যুদয়ের কথা এত বেশি বিস্মৃত হয়েছে এবং ততোধিক মাত্রায় অনধিকার-অনুশীলিত আধ্যাত্মিক কল্যাণের মোহে এত বেশি বিভ্রান্ত হয়েছে যে, সে এখন সত্যসত্যই 'ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ'। কিন্তু এ-অবস্থা তো বেদান্ত-প্রভাবের ফলে হয় নি। এটা ঘটেছে সহজ ঐতিহাসিক কারণে। ভিন্নধর্মী বিদেশী বাহুবলে (ও অজ্ঞাতপূর্ব চাতুরি-প্রয়োগে) এ-দেশের সমগ্র রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও বহুল পরিমাণে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব কয়েক শতাব্দী ধরে 'অধিকার করে' রেখেছিল এবং সেই অধিকারের জোরে প্রথম কয়েক শতাব্দীতে এ-দেশের বহু লোককে তারা তাদের ধর্মে, তাদের মনোভাবে, দীক্ষিত করতে পেরেছিল, ফলে সাধারণ ভারতবাসী ক্রমেই 'কোণঠাসা' হয়ে পড়েছিল। জাগতিক অভ্যুদয়-চর্চার অবকাশই তারা পায় নি। অন্য কৃত্য বিশেষ কিছু না থাকায় স্বভাবতঃই তারা আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকে বেশি মাত্রায় ঝুঁকেছিল। শেষ কয়েক শতাব্দী পাশ্চাত্ত্য, তথা ইংরাজ, কর্তৃত্বের ইতিহাস। ধারা মোটামুটি একই। প্রভেদ এইটুকু যে, ইংরাজ বাহুবলে বা চাতুরি প্রয়োগে তাদের মতাদর্শ এ-দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চায় নি ; এ-দেশের লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে-সব গ্রহণ করেছে। ভগ্নস্বাস্থ্য জাতির বোধ হয় গত্যন্তর ছিল না। যথা-দৃষ্ট ফল : আধ্যাত্মিক কল্যাণে শ্রদ্ধাহ্রাস ও আধুনিক অভ্যুদয়চর্চায় অশিক্ষিতপটুত্ব। এই অবনতিতে বেদান্তের হাত এতটুকুও নেই। অথচ এত অধঃপতন সত্ত্বেও ভারতবাসী মোটামুটিভাবে তার উদার দৃষ্টি ও পরমত-সহিষ্ণুতা হারায় নি। বিপরীত ক্রিয়াকলাপ না-দেখা পর্যন্ত অজানা

মানুষকে সজ্জন বলে গ্রহণ করা, তার মতাদর্শ, তার দর্শন ও তার জীবনযাত্রার ভাল দিকটাই প্রথমে দেখা, তার বক্তব্য ধীর চিত্তে শ্রবণ করা ও তৎপক্ষীয় যাবৎ সদ্‌যুক্তি সংগ্রহ করা, কতদূর অপরের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা যায় নিরন্তর তার প্রয়াস, অপরের মতাদর্শ থেকে গ্রহণযোগ্য কতটা অংশ নিলে নিজের মতাদর্শের পরিপুষ্টি হয় তার সক্রিয় অনুসন্ধান —সাধারণ ভারতবাসী চরম অবনতির দিনেও এই গুণগুলি হারায়নি। ভারতে বিভিন্ন মতাদর্শের, বিভিন্ন জীবনযাত্রা-প্রণালীর সমন্বয় শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কারণে আপনা থেকেই হয় নি, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা সর্বদাই সচেতন ভাবে পরমতের যাথার্থ্য-অযাথার্থ্য যাচাই ক'রে দেখেছে। অন্য দেশের ন্যায় এ-দেশে সমভাবেই ইতিহাসের যান্ত্রিক চাপ ছিল এবং থাকবে; কিন্তু এ-দেশের বৈশিষ্ট্য হল, সচেতন পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে সেই চাপ অন্য দেশের তুলনায়, এবং গড়পড়তা সর্বদেশের তুলনায়, কখনে বেশি, কখন বা কম হয়েছে। এইজন্যই ভারতের ইতিহাসে সমন্বয় কখন অতি-দ্রুত, কখন বা অতি-বিলম্বিত হয়েছে; যে-সব ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য দেশে বিভিন্ন মতাদর্শের সমন্বয় ঘটেছে, ভারতে হয়তো তা কখনই ঘটে উঠে নি; আবার অন্য দেশে যে-সমন্বয় অসম্ভব মনে হয়েছে ভারতের ভূমিতে তা অতি সহজে সাধিত হয়েছে। এ-সমস্তই সম্ভব হয়েছে ভারতবাসীর মনের অপার উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ফলে, এবং এই দুটি গুণ এবং এই দুটিই বেদান্তের দান।

দ্বিতীয় আপত্তি : 'বেদান্ত' শব্দে তো লোকে সচরাচর মায়াবাদী শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তই বোঝে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা যখন ভারতীয় সংস্কৃতিতে বেদান্তের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা কি শাঙ্কর বেদান্তের কথাই বোঝাতে চান না? আমরা এতক্ষণ যে-বেদান্তের কথা বললাম, যার প্রভাবে ভারতবাসীর মন উদার ও পরমতসহিষ্ণু হয়ে গ'ড়ে উঠেছে, তা তো ঠিক শাঙ্কর বেদান্ত নয়।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর : 'বেদান্ত' বলতে আমরা কেবল শাঙ্কর বেদান্ত বুঝতে চাই নি। অন্য পণ্ডিতেরা কি বলেছেন বা বলতে চেয়েছেন, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। মাধ্ব ছাড়া অন্য সব বেদান্তের যা সাধারণ বক্তব্য, 'বেদান্ত' শব্দে আমরা সেটাই বোঝাতে চেয়েছি। অতএব, সব চেয়ে ব্যাপক যতটা অর্থে 'বেদান্ত' শব্দটির প্রয়োগ সম্ভব, তাই আমরা

করেছি। তা ছাড়া, দ্বৈতবাদী মাধ্বের কাছেও 'এক' (ব্রহ্ম) ও 'বহু' (জীব ও জগৎ) সমপর্যায়ী নয়। 'বহু', তাঁদের মতে, 'একে'র উপর যতটা নির্ভরশীল 'এক' সমভাবে 'বহু'র উপর ততটা নির্ভর করে না। মাধ্বেরও মুখ্য অন্বেষ্য ঐ 'এক', যদিও তা জীবজগৎ থেকে ভিন্ন, এবং তাঁরাও স্বীকার করেন যে ঐ একের উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত 'বহু'র সম্যক উপলব্ধি হয় না। অভেদবাদী, ভেদাভেদবাদী এবং ভেদবাদী—সব বেদান্তীর লক্ষ্য হল ঐ 'একে'র উপলব্ধি এবং ঐ 'একে'র দৃষ্টিতে 'বহু'র যথার্থ মর্যাদা নির্ধারণ।

তৃতীয় আপত্তি : 'ভারতবাসীর সমাজজীবনে বা ধর্মজীবনে বেদান্তের ভূমিকা'—এই সমগ্র পদটির প্রকৃত অর্থ কী? উপনিষদকে তো বেদান্ত বলা হয়। কিন্তু সমগ্র উপনিষদে বা ঔপনিষদ দর্শনে সমাজ, ধর্ম বা আচার-অনুষ্ঠানাদির কথা কোথায়? থাকলে কতটুকুই বা আছে? আর শাঙ্করবেদান্ত? নৈষ্কর্ম্যের মহিমাকীর্তন-ই তো তার মুখ্য কাজ। উপনিষদ বা বেদান্তশাস্ত্রে অধ্যয়নাধিকার লাভের কারণভূত 'শমদমাদি সাধনসম্পদ ও মুমুক্ষুত্বাদি' অর্জনের জন্য ধর্মশাস্ত্রসম্মত সদাচারাদি-পালন বিহিত হয়েছে, একথা ঠিক; কিন্তু সেগুলি সবই যে মুক্তিপথচর্চার-ও নিয়তপূর্বভাবী হবে, এ-কথা তো বলা হয় নি। পক্ষান্তরে, বারে বারে এমন-কথা বলা হয়েছে যে, যিনি মুক্তিকামী নন, পুণ্যার্জন বা পাপস্খালন-রূপ অভ্যুদয় লাভের জন্য তাঁকেও সমগ্র সদাচার পালন করতে হবে। অতএব, সমাজ বা ধর্মজীবনে বেদান্তের উপযোগিতা কোথায়?

তৃতীয় আপত্তির উত্তর : তৃতীয় আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরের অনুরূপ। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে আমরা বলেছি, (১) মাধ্ব ছাড়া অন্য সব বেদান্তীর যা সাধারণ বক্তব্য আমাদের বক্তব্য তাই-ই এবং (২) মাধ্বও মূলতঃ ভিন্ন কথা বলেন নি। তদ্রূপ, তৃতীয় আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য : (১) শাঙ্করমতাবলম্বী ছাড়া অন্য সব বেদান্তীর যা সাধারণ বক্তব্য আমাদের বক্তব্য তাই-ই, এবং (২) শাঙ্কর বেদান্তীরাও বিধিনিষেধাত্মক সদাচার পালন ব্যাপারটি নিছক পুণ্যার্জন ও পাপস্খালনের উপায় রূপে দেখেন নি। এ-কথা ঠিক, শুধু ঐ উদ্দেশ্যেও সদাচার পালন করা যায়, কিন্তু সদাচার পালনের অন্য এক ফলশ্রুতিও আছে, এবং সেটা মোটেই অবান্তর নয়। শমদমাদির দ্বারা যেমন বৈরাগ্যমাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হয়—যে-চিত্তশুদ্ধি মুক্তিপথের অন্যতম পাথেয়—

শাস্ত্রসম্মত সদাচার পালনেও সেই-জাতীয় খানিকটা চিত্তশুদ্ধি হয়। সদাচার পালনের প্রথম ধাপই হল স্বার্থকেন্দ্রিক কামক্রোধাদি রিপু বা বাইরের অন্য প্রভাব থেকে নিজেকে কিছুটা সরিয়ে আনা। ষড় রিপু বা বাইরের প্রভাবের অর্থই হল বন্ধন, স্বাতন্ত্র্যের অপলাপ। এই সব প্রভাব যেন 'ঘাড়ে ধরে' আমাদের কাজ করিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে. শাস্ত্রীয় বা সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে কাজ করার অর্থ হল ঐ-জাতীয় প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ না-করা এবং তার চেয়ে বৃহত্তর কোন উদ্দেশ্য স্মরণে রাখা। এ-কথা ঠিক যে, প্রচলিত বিধিনিষেধও কারো কারো কাছে 'বাইরের প্রভাব'—অর্থাৎ একপ্রকার 'চাপ' মনে হতে পারে। কিন্তু সেই চাপের অধীনতা স্বীকার করলেও বিধিনিষেধ পালনে অন্ততঃ রিপুর প্রলোভন বা অন্যান্য 'বাইরের চাপে'র কাছ থেকে অতি সচেতন ভাবে, এবং যথেষ্ট আয়াস স্বীকার ক'রে, সাময়িক ভাবেও নিজেকে সরিয়ে রাখতে হয়। এইখানেই, যতটুকু হোক, এবং যত সাময়িক ভাবেই হোক, বৈরাগ্যসাধনের অবকাশ ও তদনুপাতে চিত্তশুদ্ধি। অতএব শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মেনে চলার অভ্যাসে চিত্তশোধনের অভ্যাস হয় এবং আমরা মুক্তিপথের দিকে অনেকটা অগ্রসর হতে পারি। 'ক্রমমুক্তি'র আসল বক্তব্য বোধ হয় এটাই।

চতুর্থ আপত্তি : ভারতীয় ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবনে কি কেবল বেদান্তেরই প্রভাব? অন্য দর্শনের প্রভাব কি নেই?

চতুর্থ আপত্তির উত্তর :, অন্য একাধিক দর্শনের প্রভাব অবশ্যই আছে। কিন্তু ঠিক কী অর্থে কার কতটা প্রভাব, তন্ন তন্ন করে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এক অর্থে নিশ্চয়ই শৈব. শাক্ত, বৌদ্ধ এবং হয়তো বা জৈন দর্শনেরও প্রভাব আছে; অভ্যুদয় বিবেচনায় নিশ্চয়ই 'সুশিক্ষিত চার্বাক' মতবাদের প্রভাব আছে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ দার্শনিক মতবাদের প্রভাব ব্যাপকতম, কোন্ দার্শনিক মতবাদ ভারতীয় জীবনাদর্শ, ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মে প্রবিষ্ট?

এই অর্থে শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধাদি দর্শনের প্রভাব ঠিক ততটাই যতটা অংশে তারা বেদান্তমতবাদী। বৈষ্ণব দর্শনের মতো শৈব ও শাক্ত মতবাদকেও মূলতঃ বেদান্তেরই প্রকারভেদ বলা যায়। অবশ্য, কয়েক

সম্প্রদায়ের শৈব ও শাক্ত কিছুতেই নিজেদের বেদান্তী বলে পরিচয় দিতে চাইবেন না ; খাঁটি বেদান্তীরাও কয়েকটি শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়কে বেদান্ত-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মনে করেন না। কিন্তু সেটা অনেকাংশেই ইতিহাসের বিচার্য ব্যাপার। 'সাধারণভাবে' 'বেদান্ত' বলতে আমরা এতক্ষণ যা বুঝেছি,[৪] সে-অর্থে সব শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়ই বেদান্তপন্থী। এমন কি কোন কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়কেও সাধারণ অর্থে এই দলভুক্ত করা যায়।[৫] প্রভেদ অবশ্যই আছে। ক্ষণিক-স্বলক্ষণবাদী হীনযান বৌদ্ধ কখনই এ-দলে পড়বেন না। নিঃস্বভাব-চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত-নির্বাণ-বাদী মাধ্যমিক এঁদের খুব কাছাকাছি এসেও যেন গূঢ় এক যাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ দূরে স'রে যান। যোগাচারী বিজ্ঞানবাদীর 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা' শাঙ্করবেদান্তীর অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মকে ছুঁয়েও সূক্ষ্মতর অব্যপদেশ্যতার দোহাই দিয়ে ঈষৎ স'রে দাঁড়ায়। বিশুদ্ধ শাক্তের 'শক্তি'-ও বেদান্তের কূটস্থ বা প্রায়-কূটস্থ ব্রহ্মকে কুক্ষীগত ক'রে নিজেকে—অর্থাৎ শক্তি বা গতিস্বরূপিনী নিজেকে—চরম সত্য ব'লে জাহির করে। এই শক্তিই বেদান্তের মায়া ; স্বমহিমায় নিঃস্বভাব (no Being) হয়েও ব্রহ্মবীজ বহন করার ফলে 'অঘটনঘটন-সংগঠনপটীয়সী'।[৬] হীনযান বৌদ্ধও স্বলক্ষণকে প্রায় নিঃস্বভাবের পর্যায়ে এনে স্বলক্ষণপ্রবাহের (Dynamism বা Flux-এর) সঙ্গে সমীকৃত করেছেন। অর্থাৎ, এঁদের মতে স্বলক্ষণ ও স্বলক্ষণসন্তানে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নেই—স্বলক্ষণরাজ্যে 'গ্রাহ্য' ও 'অধ্যাসেয়ে'র মধ্যে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নেই। যোগাচারীও তাঁর 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'কে অব্যপদেশ্য (অ-'গ্রাহ্য') একজাতীয় প্রবাহ (act বা dynamism) রূপে দেখেন।[৭] এই অংশে বিশুদ্ধ শাক্ত, হীনযান বৌদ্ধ ও যোগাচারী সমগোত্রীয় : তিনজনের মতেই চরম সত্য হল শক্তি, গতি, প্রবাহ, সন্তান বা dynamism (process), গোটা কোন নিত্যস্থিত কূটস্থ স্থির বস্তু নয়। মৌলিক হলেও এইটুকু অংশে

৪। পৃ ১-২ দ্রষ্টব্য।

৫। তাঁদের প্রচারিত তত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে নয়।

৬। একে স্বমহিমায় নিঃস্বভাব (non-Being অর্থাৎ কেবল dynamism) বলতে কোন বেদান্তীরই আপত্তি নেই। কিন্তু শাঙ্করবেদান্তী ভিন্ন অন্য কেউই একে 'শেষ পর্যন্ত কিছুই নয়' বলতে চাইবেন না।

৭। কান্টের 'transcendental apperception' দ্রষ্টব্য।

তাঁরা সকলেই বেদান্তবাহ্য এবং এই অংশেই এঁরা সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করতে অসমর্থ হয়েছেন। বহুতম ভারতবাসীই সর্ব পরিবর্তনের পশ্চাৎপটী নিত্য স্থির কূটস্থ সত্যের পূজারী। কূটস্থ নিত্য বস্তু কিছুই নেই, সবই নিরালম্ব শক্তি, সাধারণ ভারতবাসী এতটা শক্তিভক্ত বা প্রবাহ-ভক্ত হতে পারে নি। এই অংশে বিশুদ্ধ শাক্ত, হীনযানী ও যোগাচারী প্রভাবান্বিত করেছেন কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের। জৈন দার্শনিকের কাছে বস্তুস্থিতি ও পরিণাম (প্রবাহ=শক্তি) উভয়ই অনেকান্ত (বৈকল্পিক) ভাবে সত্য এবং বেদান্তীর 'একে'র প্রায়-সমপর্যায়ী 'কেবলী'র (সর্বজ্ঞের) প্রেক্ষিতে লৌকিক জ্ঞান, অর্থাৎ 'বহু'র জ্ঞান, সপ্তভঙ্গীনয়ে লভ্য, 'একান্ত' রূপে নয়।

(খ) আরও কথা

শাস্ত্রীয় বা সামাজিক বিধিনিষেধ পালন ভারতবাসীর কাছে, নিঃসন্দেহে, মহৎ কর্তব্য রূপে পরিগণিত। এ-প্রকার বিধিনিষেধ-পালন যদি কোন জাতির সংস্কৃতির অঙ্গ হয়, তা হলে অবশ্যই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বেদের কর্ম-কাণ্ড ও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব স্বীকৃতব্য। কিন্তু এখানেও সূক্ষ্মতর বিভেদ লক্ষণীয়। যে-কোন জাতির সংস্কৃতি তার এমন একটি 'সচেতন' জাতিগত-মনোভাব যা কেবল দার্শনিকদের দ্বারা বিশ্লেষিত ও বিচারিত নয়, বারংবার এই ভাবে বিচারিত ও বিশ্লেষিত ও মহজ্জন কর্তৃক পরিশীলিত হয়ে যা সেই জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিমানসে কমবেশি সচেতন ভাবে দীর্ঘকাল জাগরুক থাকে এবং যার ভিত্তিতে কমবেশি সচেতন ভাবে সেই জাতির প্রতিটি ব্যক্তি স্বজাতিস্বীকৃত কাজকর্ম ও চিন্তাধারার স্বপক্ষে সওয়াল-জবাব করতে পারে। সংস্কৃতি যদি এই-জাতীয় মনোভাব হয়, তাহলে ভারতবাসীর সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রার উপর বৈদিক কর্মকাণ্ড ও ধর্মশাস্ত্রের শত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা সহজে এ-কথা বলতে পারব না যে, ভারতীয় 'সংস্কৃতি'তে এদের কোনও প্রভাব আছে, কারণ ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবন মূলে বৈদিক ও তন্ত্রব ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশে পরিচালিত হলেও কেন এই সব শাস্ত্রের

কথা মানা হবে—অর্থাৎ এই সব শাস্ত্র-নির্দেশ কেন অথবা কতদূর অন্যজাতির কাছে-ও অবশ্যগ্রাহ্য হবে, অন্ততঃ গ্রহণযোগ্য হবে—তা বোঝাতে আমরা অক্ষম হতে পারি। তাই যদি হয়, তাহলে শত আপাতবিরোধ সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ভারতবাসীর দৈনন্দিন ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির কোনও সম্বন্ধ নেই, ভারতবাসীর কাছে সংস্কৃতি ও জীবন পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ভাবে পাশাপাশি চ'লে এসেছে—জীবন এক কক্ষে, সংস্কৃতি চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন এক কক্ষে; একে অপরের প্রতি উদাসীন। হয়, এই জাতীয় অদ্ভুত কথা বলতে হবে, যা অনেকেই বলেছেন ; না-হয় বলতে হবে যে, শাস্ত্র, গুরু বা মহজ্জনের আপ্তবাক্য পরম শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করাটাই ভারতবাসীর কাছে মৌল আধ্যাত্মিকতা (এবং অন্য জাতির কাছেও এটাই মৌল আধ্যাত্মিকতা 'হওয়া উচিত')। ভারতীয় চিন্তাবিদ-দের অতি-অধিকাংশই এই দ্বিতীয় কথা বলেন। দ্বিতীয় মতটির নিগূঢ় রহস্য প্রণিধানার্হ।

রহস্যটি এই যে, মানুষের জীবনবোধ, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ, মৌলিক ইষ্টানিষ্ট-বোধ, পুরুষার্থ ও অপুরুষার্থ-বোধ কোন মানুষের সাধারণ লৌকিক-বুদ্ধিগম্য নয়। মূল্যতত্ত্ব প্রত্যক্ষগম্য নয়, যৌক্তিক বুদ্ধিতে-ও মূল্য সম্বন্ধে সরাসরি কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না।[৮] এ-কথা ইষ্টানিষ্টের ক্ষেত্রেও ততটা প্রযোজ্য, যতটা প্রযোজ্য পুরুষার্থ ও অপুরুষার্থের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, আমাদের কি ইষ্ট বা অনিষ্ট 'হওয়া উচিত', এ-কথা যেমন প্রত্যক্ষানুমানগম্য নয়, কী কী বস্তু আমাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট 'হয়ে আছে' তাও প্রত্যক্ষানুমানগম্য নয়। বস্তুটি বস্তু-রূপে প্রত্যক্ষানুমানগম্য হলেও তার ইষ্টত্ব বা অনিষ্টত্ব, অথবা ইষ্টত্ব-অনিষ্টত্ব-অবচ্ছেদে সেই বস্তু, প্রত্যক্ষানুমানগম্য নয়। যা প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানাদি-লভ্য নয় তা আমরা জানি (এবং মানি) হয় স্ব স্ব সম্প্রদায়গত চিরাচরিত প্রথার ভিত্তিতে, না-হয় আমার চেয়ে যাঁরা বেশি জ্ঞানী-গুণী তাঁরা তা মানছেন ও আমাদের মানতে বলছেন

৮। দূরস্থ ভাবে যৌক্তিক বুদ্ধিতে যা পাওয়া যায় তার আলোচনা একটু পরেই করা হয়েছে।

বলে। এরই নাম শব্দপ্রমাণ। প্রথা ভুল হতে পারে, অথবা যাঁদের কাছে শিখেছি তাঁরা ভুল করতে পারেন, এ-রূপ সন্দেহ থাকলে শব্দপ্রমাণের অবকাশই থাকে না। শব্দপ্রমাণের অবকাশ সেখানেই যেখানে পরম শ্রদ্ধাভরে আমরা প্রথা, শাস্ত্রনির্দেশ বা মহজ্জনবাক্য নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে মেনে নিই। নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে মেনে নেবার অর্থ হল 'ওটা আমাদের উপর চাপান হয়েছে' এরূপ বোধ না থাকা।

যেখানে সন্দেহ বা 'চাপান হয়েছে'—এই বোধ থাকে, সেখানে অবশ্যই প্রথা বা শোনা-কথাটি অন্য প্রমাণের দ্বারা যথাসাধ্য যাচাই করে নিতে হয় (অথবা, বিকল্পে, প্রথা বা আপ্তবাক্যের প্রতি নিজ মনে অসীম শ্রদ্ধা জাগান'র সাধন করতে হয়)। অন্য মাণ যে-তত্ত্বের নির্দেশ দেয় না তাকে অন্য প্রমাণের দ্বারা যাচাই করাই বা সম্ভব হয় কী প্রকারে, এ-জাতীয় আপত্তির অবকাশ এখানে নেই, কারণ অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এ-জাতীয় তত্ত্ব স্বরূপে পাওয়াও যায় না, যাচাই-ও করা যায় না। কেবল, এদের সম্ভাব্যতা জানা যায়; তদ্রূপ, যাচাই-এর ক্ষেত্রে এদের সম্ভাব্যতা মাত্র যাচাই করে নেওয়া হয়। এই সব তত্ত্বের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা শ্রদ্ধাসম্বলিত শাব্দকপ্রমাণলভ্য। শ্রদ্ধাসম্বলিত শব্দপ্রমাণই আসল শব্দপ্রমাণ।

অতএব, বলতে হবে যে, হয় ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক কর্মকাণ্ড ও ধর্মশাস্ত্রাদির প্রভাব নেই, না-হয়, শাস্ত্রাদির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম এক ভিত্তি। আরও কথা এই যে, শাস্ত্র-বাক্যাদির প্রতি এ-জাতীয় অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার প্রয়োজন কেবল আচার-অনুষ্ঠানমূলক (ব্যক্তিগত বা সামাজিক) ধর্মজীবনেই স্বীকার্য নয়। একবার এ-প্রমাণ স্বীকার করলে বিধি-নিষেধ-বাক্যের বাইরেও এর প্রয়োগ সম্প্রসারিত হতে পারে। জ্ঞানগোচর (অর্থাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তু-রূপ) আধ্যাত্মিক (spiritual) তত্ত্বাদির ক্ষেত্রে তো এর প্রয়োগ বহুলদৃষ্ট। শব্দপ্রমাণবাদীর অনেকেই বলেন, জ্ঞানগোচর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শব্দভিন্ন অন্যপ্রমাণগম্য নয়—প্রত্যক্ষ-অনুমানাদির দ্বারা এদের সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয় না, শাস্ত্র বা আস্থাভাজন মহাপুরুষদের উপদেশ বাক্যই এ-জাতীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ। বলা বাহুল্য, সকল শব্দপ্রমাণবাদী এ-কথা

মানেন না। অনেক শব্দপ্রমাণবাদী এ-ভাবে একেবারে নিঃসর্তে জ্ঞানগোচর-আধ্যাত্মিক-তত্ত্বরাজ্যে শব্দপ্রমাণের প্রয়োগ স্বীকার করেন না। এঁদের মতে জ্ঞানগোচর অধ্যাত্মতত্ত্ব অলৌকিক প্রত্যক্ষলভ্যও বটে। শাস্ত্রজ্ঞানসাপেক্ষই হোক অথবা তন্নিরপেক্ষই হোক, এঁদের মতে যাবৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব মহাপুরুষদের কাছে অপরোক্ষ-প্রতিভাত, যদিও সে-অপরোক্ষজ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের সামিল নয়। ধর্মজীবনের মূলীভূত তাবৎ বিধিনিষেধ কিন্তু এ-ভাবে কোনও মহাপুরুষের কাছে অপরোক্ষানুভূত হয় না, কারণ বিধিনিষেধ কোন পরিনিষ্ঠিত বস্তুতত্ত্ব নয় যা প্রত্যক্ষে প্রতিভাত হবার যোগ্য। মূলীভূত বিধিনিষেধ, এঁদের কাছে, শাস্ত্রৈকগম্য। মহাপুরুষেরাও সেগুলি শাস্ত্র থেকেই পেয়ে থাকেন ; কেবল জটিল সংসাররাজ্যে তাদের যথাযথ সংকোচ-প্রসারণ ও প্রয়োজনমত কথঞ্চিৎ ইতরবিশেষীকরণ তাঁরা নিজ বুদ্ধিবলে ক'রে থাকেন। অনেকে আবার বলেন যে, জ্ঞানগোচর মৌল অধ্যাত্মতত্ত্বই কর্মক্ষেত্রে মূল বিধিনিষেধ এবং প্রয়োজনানুসারে জটিলতর কর্মক্ষেত্রে অবান্তর বিধিনিষেধের রূপ গ্রহণ করে।

যে যে অংশে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক কর্মকাণ্ড ও ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব স্বীকৃত হয়, সেই সেই অংশে ফলে ফলে মীমাংসাদর্শনের প্রভাবও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই প্রভাব কেবল 'ফলে ফলে', 'সরাসরি' নয়। কারণ, মীমাংসাদর্শন হল বেদে ও ধর্মশাস্ত্রে কার্যতঃ আচার-অনুষ্ঠান-মূলক বিধিনিষেধাদির 'মীমাংসা', অর্থাৎ যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ। উদ্দেশ্য, অবশ্য, প্রকৃষ্টতর বোধ, স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষনিরাস ; কিন্তু এই যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে বিধিনিষেধাত্মক ক্রিয়াকলাপের কোনই সরাসরি যোগ নেই। বিচার বিশ্লেষণ এক জাতীয় জ্ঞানসাধন, কর্মসাধন নয়।

এইখানেই বেদান্তবৌদ্ধাদি দর্শনের সঙ্গে মীমাংসা দর্শনের মৌলিক প্রভেদ। বেদান্তবৌদ্ধাদি দর্শনও বহুলাংশে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণাকীর্ণ, কিন্তু ঐ-সব দর্শনে বিচারবিশ্লেষণ মূলীভূত জ্ঞানীয় অধ্যাত্মসাধনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। দুই-ই এখানে জ্ঞানসাধন—অধ্যাত্মসাধন হল ভিত্তিস্পর্শী জ্ঞানসাধন, বিচারবিশ্লেষণাদি হল গৌণ, অবান্তর, কিন্তু অন্তরঙ্গ, জ্ঞানসাধন ;

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত-'দর্শন' ও বৌদ্ধ-'দর্শন' ও সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু মীমাংসা-'দর্শন' সম্বন্ধে সে-কথা বলা যায় না।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ন্যায়বৈশেষিক দর্শনও মীমাংসা দর্শনের সমপর্যায়ী। অধ্যাত্মজীবনে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক হয় শৈব, না-হয় বৈষ্ণব—অর্থাৎ মূলে এঁরা বেদান্তী।[৯] সেই মৌল অধ্যাত্মসাধনের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক 'দর্শনের' কোনই সম্বন্ধ নেই। দার্শনিক মীমাংসক তবুও তো বিধিনিষেধাদি ধর্মের বিচারবিশ্লেষণ করেন—কর্মজীবনের আসল যা উপজীব্য তারই বিচারবিশ্লেষণ করেন। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিক তাও করেন না! তাঁদের কৃত বিচারবিশ্লেষণের সঙ্গে বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্কই নেই—সাধন ও 'দর্শন' তাঁদের কাছে দুই ভিন্ন জগতের ব্যাপার। প্রধানতঃ, ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, ঐন্দ্রিয়প্রত্যক্ষভিত্তিক অনুমান এবং যুক্তি দ্বারা পরিশীলিত ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ (ও অনুমান)—এই তিন পদ্ধতি অবলম্বনেই তাঁরা জগৎ, আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাবৎ জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী। নামে 'শব্দপ্রমাণ'[১০] স্বীকার করলেও তার উপর কস্মিন কালে তাঁরা একান্তনির্ভর হন নি। অনুমানের দ্বারা আত্মা-ঈশ্বরাদি অধ্যাত্ম (spiritual) বিষয়ে যতটা জ্ঞান লাভ সম্ভব 'দর্শন'-ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে তাঁরা কোন দিন চান নি। অধ্যাত্মসাধন তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগতের ব্যাপার।

অতএব, প্রমাণিত হল যে, ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবন ও তার আধ্যাত্মিক মনোভাব বহুলাংশেই বেদান্তমতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। বেদান্ত ভিন্ন অন্য মতবাদের প্রভাব হয় আদৌ নেই, না-হয় কেবল সেটুকু অংশে যে-টুকুতে ঐ মতবাদ বেদান্তের সামিল, না-হয় ঐ প্রভাব একান্ত পারম্পরিক (indirect), না-হয় যে যার নিজ নিজ সম্প্রদায়-সীমাবদ্ধ। বেদান্তের প্রভাব প্রকৃষ্ট পরিলক্ষিত হয় ভারতবাসীর উদারতম দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং

৯। যে-অর্থে পূর্বে শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদকে বেদান্তেরই প্রকারভেদ বলা হয়েছে, সেই অর্থে।

১০। উপমান প্রমাণের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে তার উল্লেখ করা হল না।

অসাধারণ পরমতসহিষ্ণুতায়, যার ভিত্তিমূল প্রোথিত আছে বৈদান্তিক নিত্যস্থির 'একে'র প্রতি তার অবিচলিত আস্থায় এবং ঐ 'একে'র সূত্রে পরিবর্তনশীল জগদ্বৈচিত্র্যকে নিত্যবিধৃত রূপে দেখার অভ্যাসে।

(গ) অনেকান্ত

সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে যে-কেউ যে-কথাই বলুক, তা অন্ততঃ অংশতঃ সত্য হতে বাধ্য। বিভিন্ন পরিস্থিতি ও বিভিন্ন সংস্কার অনুযায়ী তা অংশতঃ মিথ্যাও হতে পারে। অতএব, আমাদের কর্তব্য যথাসম্ভব মিথ্যা অংশ বাদ দিয়ে সত্য অংশ স্বীকার করে নেওয়া। প্রায়শঃই দেখা যায় পরস্পর বিসদৃশ মতবাদের মিথ্যা অংশ বাদ দিলে সত্যাংশে তারা অভিন্ন থাকে। এ-সব ক্ষেত্রে বেদান্তী মনোভাব সহজেই আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের মতো ক্ষেত্রে, যেখানে মূল সকল প্রশ্নই গভীরতলস্পর্শী এবং যেখানে পরিস্থিতি ও সংস্কারবৈচিত্র্যের অবকাশ প্রায় কিছুই নেই, সেখানেই যেন মতভেদ সব চেয়ে বেশি এবং অস্থি-মজ্জাগত মনে হয়; অথচ গভীরতত্ত্ব-সন্ধানী দার্শনিকেরা অতি-অধিকাংশই সদ্বুদ্ধিচালিত। তাহলে কি বলতে হবে, একই প্রশ্নের বিভিন্ন দার্শনিক উত্তরের সব কটিই পুরোপুরি সত্য? পরিস্থিতি ও সংস্কারজন্য মিথ্যাংশ বাদ দেবার প্রশ্ন এখানে নেই—ধ'রে নিতে হবে যে, খাঁটি দার্শনিকের মন সংস্কারমুক্ত এবং পরিস্থিতি-বৈচিত্র্যের উর্ধ্বে। তাহলে কি পরস্পর-বিসদৃশ, প্রায়শঃই পরস্পরবিরুদ্ধ, সব কটি মতবাদই আমাদের গ্রহণ করতে হবে? বৈদান্তিক উদারতা কি এখানে সত্যই কার্যকর হবে, এবং হলে কতখানি হবে?

বিচারবিতণ্ডা কালে ভারতীয় দার্শনিক যতই স্বপক্ষস্থাপন ও পর-পক্ষপর্যুদাসে প্রয়াসী হোন না কেন, দৈনন্দিন জীবনে, এমন কি আধ্যাত্মিক মনোভাবে, একে অপরের মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন।[১১] নিরাকার ব্রহ্মবাদী সাকার দেবতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা

১১। এমন কি—পূর্বে যে-কথা বলা হয়েছে—পরপক্ষখণ্ডন প্রসঙ্গেও তাঁরা ভিন্ন মতের স্বপক্ষে যত সদ্যুক্তি থাকতে পারে তা সংগ্রহ ক'রে থাকেন।

জ্ঞাপন করেন,[১২] সাকারোপাসক এক সম্প্রদায়ের লোকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবতার প্রাপ্য সম্মান যথাযথ প্রদর্শন করেন। এমন কি সমাজে জ্ঞানী-গুণী চার্বাক-মতাবলম্বীর স্থানও কেবল চার্বাকমত গ্রহণের জন্য অন্যের নিচে নির্দিষ্ট হয় না। ভিন্ন মতের প্রতি এই-যে যথাযোগ্য শ্রদ্ধানিবেদন এটা কেবল 'লোক-দেখান ব্যাপার' নয়। ভারতবাসী অন্তর থেকেই এই শ্রদ্ধা নিবেদন করে, অন্ততঃ কখনও 'খাঁটি' অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না।[১৩] অন্যের মতবাদ এবং অন্যের আধ্যাত্মিক মনোভাব আমার মতবাদ ও আধ্যাত্মিক মনোভাব থেকে ভিন্ন (এমন কি এর বিরোধী) হলেও আমার পক্ষে তা যে 'স্বীকরণ'[১৪] না করেও 'গ্রহণ' করা সম্ভব হয়, প্রতিটি ভারতবাসীর ব্যবহার তার প্রমাণ ঃ দৃষ্টতঃ আমরা প্রত্যেকেই অপরের মতাদর্শ 'গ্রহণ' (অস্বীকৃতগ্রহণ) করে ব'সে আছি। শুধু নঞর্থক অ-বর্জন নয়, সদর্থক গ্রহণ, অথচ পুরোপুরি স্বীকরণ নয়।[১৫]

এখন প্রশ্ন এই—যৌক্তিক বিচারের দৃষ্টিতে এ-জাতীয় 'অস্বীকৃতগ্রহণ' সমর্থিত হয় কি না, এবং হলে কতটা? বর্তমান নিবন্ধে আমরা দেখাব যে, যুক্তিতে-ও এর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, আমরা আরও দেখাব যে, পরস্পরবিসদৃশ. পরস্পরবিরুদ্ধ, দার্শনিক মতের প্রত্যেকটির 'স্বীকৃতিগ্রহণ'-ও সর্বাংশে অযৌক্তিক নয়। অর্থাৎ, পরস্পর-বিসদৃশ, পরস্পরবিরুদ্ধ, দার্শনিক মতবাদের অস্বীকৃতগ্রহণ এবং স্বীকৃতগ্রহণ উভয়ই যুক্তিসাধ্য। এ হল একপ্রকার অনেকান্ত দৃষ্টি। আমরা দেখাব যে,

১২। আধুনিক নিরাকারবাদীদের কথা আমরা বলছি না। আধুনিক কালে বিভিন্ন বিজাতীয় কারণের সহভাব-দোষে অনেক কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। পাদটীকা ১৩ দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্ত্য মনোভাবে প্রভাবিত নগরবাসী ভারতীয়ের সংস্কৃতির কোনই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এখনও গ'ড়ে উঠেনি।

১৩। দীর্ঘ সহভাব-বশতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে জড়িত হয়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মনোভাব অনেক সময়ে উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকার গ্রহণ করে। সে-দিকের আলোচনা আমরা করছি না।

১৪। 'আত্মসাৎ' শব্দটি এখানে যোগ্যতর হত যদি না শব্দটি নিন্দাসূচক অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হত।

১৫। পরবর্তী অনেক পরিচ্ছেদে একেই আমরা বলেছি 'সম্ভাব্য গ্রহণ' বা 'গ্রহণ যোগ্যতা'। স্বীকৃতগ্রহণকে বলেছি 'প্রকৃত গ্রহণ', 'সত্যসত্য গ্রহণ', 'বাস্তবগ্রহণ'। 'আত্মসাৎ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারলে এতগুলি অন্য শব্দের প্রয়োজন হত না।

সর্ববেদান্তসাধারণ 'খাঁটি' বেদান্ত মূলে অনেকান্তবাদী।[১৬]

সব মতবাদই সত্য, এ-কথার অর্থ এই নয় যে, এরা কেবল সারাংশে সত্য এবং এক, অবশিষ্টাংশে মিথ্যা এবং স্থানকালপাত্রভেদে বিভিন্ন; অর্থ এও নয় যে, মতগুলি পরস্পরের পরিপূরক, অর্থাৎ এমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন অংশে সত্য যে, তাদের সমাহারেই আসল সত্য লব্ধব্য। তৃতীয় এ-অর্থও অগ্রাহ্য যে, একটি মতবাদের পথে কিছুটা অগ্রসর হলে অন্য একটি মতবাদের পথ আপনা থেকেই উন্মুক্ত হয় এবং এই প্রকার ক্রমবিকাশের পথে আসল সত্যটি ফুটে উঠে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ কেন অগ্রাহ্য তা আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি। যে-রাজ্যের সত্যমিথ্যার কথা আমরা আলোচনা করছি তা এত গভীর ও মৌলিক যে সেখানে স্থানকালপাত্রভেদের অবকাশ নেই; কাজেই অংশতঃ এক এবং অংশতঃ ভিন্ন হবার কথাই সেখানে নেই। দ্বিতীয় অর্থের ক্ষেত্রে-ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। উভয় ক্ষেত্রেই অনেকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য', দ্বন্দ্বমাধ্যমে 'আত্মলাভ', 'দ্বান্দ্বিক প্রগতি' প্রভৃতি অনেক কথা বলেছেন। কথাগুলি নিঃসন্দেহে শ্রুতিমনোহর, কিন্তু নিহিতার্থের উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত এদের ব্যবহার গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট থেকে যায়; প্রকৃত সমাধান না পেয়ে যা আমরা পাই তা হল সমাধান-বিলাস।[১৭] পরে আমরা দেখাব যে, অনেকান্তদৃষ্টিই এই নিহিতার্থ।

সত্যের ক্রমবিকাশের কথাটাও অগ্রাহ্য। কেন না, ক্রমবিকাশের পথে যাবৎ ফেলে-আসা সত্যকে হীন চক্ষে দেখতে হয়, অথচ মৌল মতবাদগুলির কোনটাই অপরের অপেক্ষায় হীনতর প্রতিপন্ন হতে চায় না। ক্রমোপলব্ধির পথে আমি যে-সব মতবাদ পিছনে ফেলে এসেছি তাদের অন্বেষ্য সত্যগুলি আমার কাছে হীন হতে পারে, কিন্তু অন্য এক পথচারীর কাছে তাদেরই একটাই তো চরম লক্ষ্য। আমার পথে অগ্রসর হবার কালে আমি যুক্তির কশাঘাতে সেটিকে পঙ্গু করে যতটা আমার

১৬। জৈন অনেকান্তবাদের সঙ্গে বৈদান্তিক অনেকান্তবাদের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বর্তমান নিবন্ধের বিচার্য নয়। তথাপি পৃঃ ৮ দ্রষ্টব্য।

১৭। পূর্বে আমরা যে 'ঐক্যসূত্রে বৈচিত্র্যের বিধৃতি'র কথা বলেছি সেটা কোনও সমস্যার মৌলিক সমাধান হিসাবে বলি নি।

কাজে লাগাবার লাগিয়েছি, কিন্তু অন্যজনও তো ঠিক একই পদ্ধতিতে আমার সত্যটি পঙ্গু ক'রে এগিয়েছে। প্রতিটি পথিকের পথ নির্ধারিত হয়েছে তার পূর্বস্বীকৃত এবং তখনও-পর্যন্ত-যুক্তি-দ্বারা-অসমর্থিত সত্যের দ্বারা। প্রত্যেক সত্যান্বেষীর অবস্থা যে-ক্ষেত্রে এই প্রকার, সে-ক্ষেত্রে আমার সত্যটাই সকলে মেনে নেবে, এ দাবি অযৌক্তিক।

অনেকেই হয় তো এ-সব কথা মানতে চাইবেন না। তাই পুনরুক্তির ভয় থাকা সত্ত্বেও আমাদের আর একটু পরিষ্কার করে' বলা প্রয়োজন। যে-সব মতবাদ, যে-সব সত্যের কথা এখানে বলা হচ্ছে তারা হল একেবারে মূলগত মতবাদ, মৌল সত্য, যে-গুলি দর্শনশাস্ত্রে 'Fundamental isms' নামে পরিচিত, যাদের মধ্যে বাদবিতণ্ডা, কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, কত শতাব্দী ধ'রে চলে আসছে, অথচ চূড়ান্ত জয়পরাজয়ের বার্তা আজও বিঘোষিত হয় নি—আদৌ কোন কালে হবে কি না সন্দেহ—এবং যে-গুলি কেন্দ্র ক'রেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাবৎ অবান্তর মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি মৌল দর্শনশাস্ত্র এদেরই একটি-না-একটিকে কেন্দ্র ক'রে আদি কাল থেকে মোটামুটি একই বৃত্তপথে আবর্তিত হয়ে চলেছে। দর্শনের মূলীভূত ধারণাগুলি চিরদিনের জন্যই মৌলিক—তারা চিরকালই মৌলিক ছিল এবং চিরকালই মৌলিক থাকবে। বর্তমান নিবন্ধে এইজাতীয় মতবাদগুলিই বিবেচ্য। মূল-ঘেঁসা অথবা কাণ্ড-শাখা-লগ্ন বর্ণসঙ্কর মতবাদগুলি এ-ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা দেখাব, মৌল মতবাদগুলির প্রতিটিই বৈকল্পিক ভাবে সত্য, এবং পুরোপুরি সত্য। অর্থাৎ, সত্য অনেকান্ত, সহস্রশীর্ষ।

আমরা দেখাব, যে-কোন অনেকান্ত দার্শনিক যে-কোন মৌল মতবাদে পরমার্থ লাভ করতে পারেন। সব মতবাদই তাঁর কাছে সমভাবে পরমার্থ, যদিও সচরাচর তিনি একটি নির্দিষ্ট মতবাদ স্বীকৃত-গ্রহণ ক'রে থাকেন। আমরা আরও দেখাব যে, খাঁটি বৈদান্তিক অনেকান্তবাদী এইটুকুতে তৃপ্ত নাও হতে পারেন। সাধনার বলে তিনি বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বদোলে দোল খেয়ে 'পরিপূর্ণ জীবনের' আস্বাদ-ও গ্রহণ করতে পারেন। এই বিশ্বদোল গতিপ্রাণ হয়েও সামগ্রিক মূর্তিতে এক পরিপূর্ণ স্থিতি—এমন এক পুরুষার্থ যা প্রতিটি চরম পুরুষার্থ

কুক্ষীগত ক'রে পূর্ণতার সত্যে প্রোজ্জ্বল, পূর্ণতার আনন্দে একই কালে চলচঞ্চল অথচ সমাহিত। বৈচিত্র্য—এমন কি পরস্পর-বিরুদ্ধ গতিসত্তার—এই বিশ্বদোলের সামগ্রিক মহাসত্যে বিধৃত।

চরম সত্যই হল নিরবশেষ শান্তির পুণ্যতীর্থ। নানা বিভিন্ন পথে সেই তীর্থে পৌঁছান যায়। বিশেষ এক পথ ধ'রে সেই তীর্থে পৌঁছে কেউ তৎপথৈকলব্ধ সত্যটিকে পরম পুরুষার্থ বোধে তার কাছেই আত্ম-নিবেদন করেন; অন্য কেউ অন্য পথে তাঁর চরম সত্যে পৌঁছে তদনুরূপ পরমার্থ লাভ করেন। অপর সত্যের নিন্দা বা অকারণ প্রশস্তির প্রয়োজন এঁদের কারুরই থাকে না। যে যাঁর নিজ নিজ সত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। পক্ষান্তরে, ভূমানন্দে বলীয়ান কেউ বা বিভিন্ন সত্যের তরঙ্গশিখরে দোল খাওয়াটাই পরম পুরুষার্থ মনে করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দর্শনে যুক্তির স্থান

(ক) দর্শনরাজ্যে যুক্তির ভূমিকা

যুক্তির সাহায্যে অনেকান্তবাদ স্থাপনই বর্তমান নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য প্রতিটি বিভিন্ন মৌলিক মতবাদের খুঁটিনাটি দোষত্রুটি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। সাধারণ ভাবে, দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য কী, কিসের অনুসন্ধানে সে ব্যাপৃত—অর্থাৎ তার সমস্যাগুলির আসল উৎস কোথায়—কী পদ্ধতিতে ঐ-সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়, বুদ্ধি—যার ইংরাজি নাম reason—পদার্থটা কী এবং তার প্রকৃত কাজই বা কী, এই সব কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দেবার চেষ্টা করলেই দর্শনের অনেকান্ততা স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিক্ষিত দার্শনিক মহলে 'দর্শন' শব্দটি এক নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়—সেখানে 'দর্শন' শব্দের অর্থ বুদ্ধির সাহায্যে সত্যের অবধারণ, এবং 'বুদ্ধি' বলতে বোঝায় সেই বৃত্তি যার ইংরেজি নাম reason বা thinking। বুদ্ধির তিন প্রধান কাজ হল : (১) নির্বচন, অর্থাৎ যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে বক্তব্যের উপস্থাপন, (২) বিষয়বস্তুর লক্ষণ নির্দেশ, অর্থাৎ বক্তব্যের যথাযথ বিশ্লেষণ এবং (৩) যুক্তিতর্ক। নির্বচন ও বিশ্লেষণ দ্বারা দেখান হয় প্রস্তাবিত বিষয়বস্তুটি ঠিক কী এবং তার কতটা অংশ অবিমিশ্র 'পাওয়া' অর্থাৎ অপরোক্ষ-অনুভূতিলব্ধ (just received অথবা আরও পারিভাষিক অর্থে 'given'), এবং কতটা বা বুদ্ধি ও কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট। যুক্তিতর্কের কাজ হল তৎতৎ সিদ্ধান্তের সমর্থন। কারো কারো মতে যুক্তিতর্ক কেবল সিদ্ধান্তবাক্যের সমর্থন নয়, তার আরও একটা কাজ আছে ; সেটা হল প্রস্তাবিত বিষয়টি প্রত্যক্ষে ধরা না পড়লে তাকে পরোক্ষ জ্ঞানের গোচরে আনা। এই শেষ কাজটি বাদে বাকি কাজগুলি সম্বন্ধে কারো কোনও সন্দেহ নেই।

যত ঝামেলা এই শেষ কাজটি নিয়ে। বুদ্ধি দ্বারা কি সত্যই কোন নতুন জিনিষ জানা যায়? 'নতুন' শব্দের অর্থ, যা এখন পর্যন্ত জানি নি। ভারতীয় দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই বলেন—হ্যাঁ, পাওয়া যায়, এবং মোটামুটি ভাবে এই জাতীয় জ্ঞানকে তাঁরা অনুমান বা অনুমিতি (inference) বলেন। তাঁরা বলেন—যে-সব জিনিষ আগে থেকে আমাদের জানা থাকে তাদেরই কয়েকটি একভাবে পরস্পরসম্বদ্ধ করে' নিয়ে তো আমরা হামেশাই নতুন নতুন বিষয় জানতে পারি। এতে বিস্মিত হবার কী আছে? তাঁদের দিক থেকে তাঁরা ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু আসল প্রশ্নটা যাঁরা তুলেছেন তাঁদের অনুসন্ধান আরও গভীরে। ভারতীয়েরা জানা সত্য থেকে অজানা সত্যে যাওয়া ব্যাপারটি যে-ভাবে বুঝেছেন সে ব্যাপার তো জন্তুজানোয়ারদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যাকে হিউম বলেছেন 'associational passage'। মানুষের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় জ্ঞানপ্রসার মাধ্যম-পরম্পরায় বিলম্বিততর, কিছুটা বেশি সতর্ক এবং অভিজ্ঞতা-পরিশীলিত—এই মাত্র বিশেষ। এখানে হিউম বা ভারতীয় দার্শনিকেরা যে-অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা বলেন তা একপ্রকার প্রত্যক্ষই—দূরস্থ[১] ক্ষীণ প্রত্যক্ষের সামিল—যদিও সে-প্রত্যক্ষ নির্দিষ্ট কোন 'একটা' বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে না, অনুষঙ্গ (association) নিয়মে সে প্রত্যক্ষ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ত সঞ্চরণশীল। প্রত্যক্ষ এবং 'তথাকথিত' অপ্রত্যক্ষ, উভয় জ্ঞানেই সে সরাসরি বিষয় 'পায়', উভয় জ্ঞানেই বিষয় তার কাছে কোনও-না-কোনও ভাবে 'দত্ত' (given) হয়ে আছে।[২] যাঁরা কিন্তু

১। দূরত্ব এখানে কেবল দৈশিক নয়, কালিক-ও বটে।

২। যত সহজে বলা হল, ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়। ভারতীয়েরা বলেন অনুমানে অনুমিত পদার্থের 'বিশেষ আমরা একেবারেই পাই না, পক্ষস্থ পদার্থটি পাই কেবল সামান্যধর্মপুরস্কারে। হিউমের মতে বিশেষ ও সামান্যধর্মের মধ্যে কোন মারাত্মক প্রভেদ নেই—সামান্য বিশেষেরই অতি-অস্পষ্ট রূপ। উভয় মতেই কিন্তু পদার্থটি আমরা 'পাই,' অর্থাৎ সেটা 'আছে' বলে জানি। Formal theory of inference-এ কিন্তু পদার্থটির 'থাকা'র কোন কথাই নেই। মাত্র Formal inference-এ এমন কি সামান্যাকারেও কিছু 'থাকা'র কথা নেই। Formal inference দেয় শুধ্ সামান্যাকার-পুরস্কারে একটা কেবল-'সম্ভাব্য' দৃষ্টান্তত্বাবচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত (possible instantiation)।

বুদ্ধি দ্বারা নতুন কোন জিনিষ জানা যায় কিনা প্রশ্নটি তুলেছেন তাঁরা 'বুদ্ধি' বলতে 'দত্ত' (given) রূপে কিছু 'পাওয়া'র বৃত্তি বোঝেন নি। বুদ্ধি তাঁদের কাছে এমন এক চিত্তবৃত্তি যা কেবল নিজের তাগিদে—বাইরে দিকে না তাকিয়ে—অমূর্ত (abstract), অর্থক্রিয়া-অকারী, অবস্তুসৎ এমন সব ছাঁচ (Model) বা কাঠামো (structure) তৈরি করে যার মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত পাওয়া ও প্রাপ্তব্য জিনিষ ফেলা যায়। সার্থক ভাবে ফেলতে পারলে বিশ্বের তাবৎ পাওয়া এবং প্রাপ্তব্য জিনিষ-ই এক—একাধিক model-এর ক্ষেত্রে একাধিক—পরিপাটি system-এ ধরা পড়ে। সমস্ত অতীত, সমস্ত বর্তমান ও সমস্ত ভবিষ্যৎ জিনিষ, অবশ্যই, তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য (individuality) সমেত ধরা পড়ে না। এঁরা শুধু এইটুকু বলতে চান যে, এই জাতীয় ছাঁচ বা কাঠামো তৈরি করার মূলে আছে এক সহজাত স্বীকৃতি যে, বিশ্বের সমস্ত বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ তাদের কোন-না-কোন সামান্য-ধর্ম-পুরস্কারে কোন-না-কোনো মডেলে ধরা পড়বেই। ধরা পড়বেই—এই সহজাত স্বীকৃতির বলেই আমরা সামান্যধর্ম পুরস্কারে জানা জিনিষ থেকে অজানা জিনিষের একপ্রকার ধারণায় উপনীত হতে পারি। অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক একেই অনুমান (inference) বলেন, এবং এই অনুমান ভারতীয়দের 'অনুমান'[৩] থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। অনুমান এখানে পরিশীলিত বা অপরিশীলিত associational passage-মাত্র নয়।

যেহেতু 'সমস্ত' জিনিষকেই এই কাঠামোয় ধরা আমাদের এক সহজাত (*a priori*) বৃত্তি, যা পাওয়া-জিনিষের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না, অথবা যা-পাওয়া জিনিষ থেকে সরাসরি নিষ্কাশিত হয় না, এই জন্যেই তাঁরা এই কাঠামো এবং কাঠামোর অন্তর্ভূত অজানা জিনিষের সামান্যতঃ-জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকে 'formal' বলেন। এঁদেরই প্রশ্ন হচ্ছে, এই formal বুদ্ধি দিয়ে নতুন কোনও জিনিষ কি 'পাওয়া' যায়? অজানা-জিনিষের সামান্যতঃ ধারণা হয়, সত্য। কিন্তু এই সামান্যতঃ-ধারণা কোন নতুন জ্ঞান বা নতুন জিনিষের জ্ঞান নয়। বস্তুতঃ, কাঠামোয় ধরা এবং সামান্যতঃ-ধারণা—এ দুটা একই কথা।

৩। বৌদ্ধদের 'অনুমান' পাশ্চাত্ত্যস্বীকৃত অনুমানের অনেকটা কাছাকাছি।

শুধু কাঠামোয় ধরা অথবা কাঠামোর মাধ্যমে সামান্যতঃ জানা এঁদের মতে নতুন জ্ঞান নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে—এত বড় যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র, যেখানে বুদ্ধির এত সমারোহ, সেখানে কি এই পদ্ধতিতেই আমরা নতুন জ্ঞান লাভ করি না? এঁরা উত্তর দেন—না, নতুন জ্ঞান লাভ করতে হলে আরও একটি প্রক্রিয়া আবশ্যক। সেটি হল—যে বিশেষ-বস্তু সম্বন্ধে আমার সামান্য-ধারণা জন্মেছে সেটি বাস্তব জগতে প্রত্যক্ষ করা, অথবা এমন কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যার দ্বারা সেটা যে বাস্তব জগতে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। অর্থাৎ, নতুন জ্ঞান হয় বাস্তব বা কোন-না-কোন ভাবে 'সম্ভাব্য' প্রত্যক্ষের দ্বারা। এই খানেই, তাঁদের মতে, অমূর্ত বুদ্ধি ও মূর্তিপ্রত্যক্ষের মিলন, এবং এই মিলন না-ঘটা পর্যন্ত, তাঁদের মতে, কোন নতুন জ্ঞান জন্মে না।

আবার প্রশ্ন উঠতে পারে—এই অমূর্ত কাঠামো এবং তার গঠনের রীতিনীতিগুলি কি আমরা কোনও ভাবে প্রত্যক্ষ করি না? যদি না করি, তাহলে তাদের সম্বন্ধে এত কথাবার্তা উঠে কী ভাবে? সমগ্র Logic শাস্ত্রটা এল কী ভাবে? এঁদের কেউ কেউ বলেন—হাঁ, প্রত্যক্ষ করি, তবে সে-প্রত্যক্ষ প্রাকৃত প্রত্যক্ষ নয়, প্রকৃতি-অন্তর্গত দেশকাল বা শুধু কাল দ্বারা অবছিন্ন বা কার্যকারণসম্পর্কে সম্পর্কিত কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ নয়; ওটা হল এক জাতীয় অতিপ্রাকৃত প্রত্যক্ষ, এক ধরণের আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎকার, যার নাম অপরোক্ষানুভূতি।

অমূর্তবুদ্ধি-বাদী সকলেই কিন্তু এ-কথা বলেন না। অন্যেরা বলেন, এই কাঠামো ও তার গঠনরীতি আমরা প্রত্যক্ষ করি না, এবং প্রত্যক্ষে এদের ধরবার কোন প্রয়োজন-ও নেই। এরা 'আমাদের' সহজাত বৃত্তি, যা আমরা 'ব্যবহার' করি মাত্র। কেবল ব্যবহারেই এদের পর্যবসান, কেবল ব্যবহারেই এদের চরম সার্থকতা। কেউ বা আবার নিছক ভাষা-ব্যবহারপ্রণালীর সঙ্গে এদের এক ক'রে দেন।

এঁরা সকলেই কিন্তু স্বীকার করেন যে, ব্যবহারাত্মক এই কাঠামো এবং এর গঠনরীতি আমাদের সহজাত। কেউ বা আবার মনে করেন, এই সহজাতত্ব ব্যাপারটি গভীর অর্থপূর্ণ। তাঁরা বলেন, এই সহজাত কাঠামো এবং এর মৌল রীতিগুলি আমাদের জীবনের সমগ্র পরিস্থিতি

ঘিরে, হয়তো বা সোজা এর কেন্দ্রস্থলে, এক অপরিবর্ত শাশ্বত পরিমণ্ডল রচনা করে আছে, যা মানবজীবনের অক্ষয়, অব্যয়, গভীরতম আধ্যাত্মিক উৎস। অন্যেরা বলেন, এগুলি পুরোপুরি ভাবে 'প্রাকৃত' মানবজীবনেরই অন্তর্গত, যদিও এদের খেলা চলে প্রাকৃত জীবনের গভীরতর অন্তস্তলে। প্রাকৃত জীবনেরই অন্তর্গত ব'লে এদের একান্ত কোন অক্ষয়ত্ব, অব্যয়ত্ব, চিরন্তনত্ব নেই। প্রকৃতির ধর্ম'ই হল সে পরিবর্তনশীল, এবং প্রতি যুগসন্ধিক্ষণে অন্তস্তলেরও সুলক্ষ্য পরিবর্তন ঘটে, তা সেই অন্তস্তল মানুষের সমাজবুদ্ধিই হোক বা তদুত্তীর্ণ অন্য অবস্থাই হোক। অন্তস্তলের স্ফুট বিবর্তনের ফলে এতাবৎকাল অবধি ব্যবহ্রীয়মান মৌল কাঠামো ও তার রীতিনীতিরও বিলক্ষণ পরিবর্তন সাধিত হয়। আধুনিক যুগে এই পরিবর্তন এত দ্রুত তালে ঘ'টে চলেছে যে, অনেক সময়েই আমরা সামলে উঠতে পারি না। সেইজন্যই নানা সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কাঠামো নিয়ে আজ এত মারামারি কাটাকাটি।

প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার এই সুযোগ নিয়ে অন্য আর এক দল দার্শনিক নতুন এক ধুয়ো তুলেছেন। তাঁরা দাবি করছেন, যে-কোন লোকের যে-কোন কাঠামো গ'ড়ে তোলবার অধিকার আছে, শুধু দেখতে হবে গঠিত কাঠামো যেন পারিপাট্যসাধক গুণাবলীসংবলিত হয়। ব্যাপারটা যেন অনেকটা এই রকম—যেন আধুনিক এক যন্ত্রবিদ তাঁর বিলাসবহুল নিরীক্ষাপ্রকোষ্ঠে ব'সে—জগৎ কেমন, জগতে কী ঘটছে বা না-ঘটছে সেদিকে দৃক্‌পাত-মাত্র না ক'রে—পরীক্ষামূলক ভাবে একের পরে এক model (কাঠামো) কল্পনা ক'রে যান। এ-জাতীয় কাজ দোষাবহ হয় না যদি মডেল-রচয়িতা অবহিত থাকেন যে, যে-কোন মডেল সৃষ্টিরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু আধুনিক যুগে বুদ্ধির যেন রীতিমত দৌরাত্ম্য চলেছে। লোকে অর্থসঞ্চয় করে ভোগে ও অন্যান্য সৎ-অসৎ নানা কাজে ব্যয় করার জন্য, কিন্তু কৃপণ অর্থ সঞ্চয় করে কেবল অর্থসঞ্চয়ের জন্য—অর্থসঞ্চয়েই তার পরিসমাপ্তি। আধুনিক কালে আমরা দেখতে পাই, বুদ্ধিজীবীরা বেশ অনেকেই এই কৃপণের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—নিছক বুদ্ধির 'কসরৎ' দেখিয়ে তাঁরা কাঠামোর পর কাঠামো রচনা ক'রে চলেছেন। এ-ও ততটা দোষের

হত না যদি-না তাঁরা বুদ্ধিজীবীদের প্রতি জনসাধারণের সহজ শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে নিজেদের এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিটি একমাত্র ন্যায্য মনোবৃত্তি ব'লে অপরের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। এইখানেই বুদ্ধির দৌরাত্ম্য। আধুনিক কালে দর্শন জগতে এই দৌরাত্ম্য প্রকটতম আকার ধারণ করেছে। অর্থনীতি ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ-জাতীয় দৌরাত্ম্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্তমান—তবুও সে-সব ক্ষেত্রে তাঁরা শেষ পর্যন্ত ধার-করা বা ঘরে-বসে-তৈরি-করা মডেলগুলি 'কাজে লাগাবার' চেষ্টা করেন। কিন্তু আধুনিক 'দার্শনিক'দের অনেকের সে-বালাই নেই।

বুদ্ধির এই চরম দৌরাত্ম্যর মূলে রয়েছে বুদ্ধিজীবীর একজাতীয় বিস্ময়কর অহমিকা। নিঃসন্দেহে, বুদ্ধি অতি উচ্চস্তরের মনোবৃত্তি, বুদ্ধির এই মর্যাদা স্বীকার না করে' উপায় নেই। কিন্তু এই মর্যাদাই হয়েছে বহু বুদ্ধিজীবীর 'কাল'। অহমিকায় স্ফীত হয়ে তাঁরা অনেকেই মনে করছেন বুদ্ধি এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, সমস্ত জ্ঞানের, সমগ্র মানবজীবনের, উপরেই বুঝি তার একাধিপত্য। তাই অনেক সময়ে দেখা যায়, এঁরা জ্ঞানের একটা প্রাথমিক মাপকাঠির কথাই ভুলে গেছেন—ভুলে গেছেন যে, বস্তু-জ্ঞানের অন্ততঃ একটা মাপকাঠি হল বস্তুটির সম্ভাব্য প্রত্যক্ষত্ব। বিশেষ ক'রে, দর্শন জগতে, অনেক সময়ে এঁরা প্রত্যক্ষগোচর কোন-কিছুর উপর কিছুমাত্র নির্ভর না-ক'রে, অনেক সময়ে বা সামান্য কয়েকটি প্রত্যক্ষ বস্তু অবলম্বন ক'রে, বুদ্ধির ঊর্ণাজাল রচনা ক'রে যান; বোঝেন না—বা বোঝবার চেষ্টা-ও করেন না—সে-জাল কত 'অপলকা', কত সামান্য আঘাতেই তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে।

(খ) বুদ্ধির প্রকৃত কাজ

বুদ্ধি, নিঃসন্দেহে, মানুষের সহজাত বৃত্তি। কিন্তু এর কাজ হল প্রত্যক্ষলব্ধ এবং প্রত্যক্ষলভ্য যাবৎ বস্তু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা, একটা 'মডেল'র অন্তর্ভূক্ত করা—ঘরে ব'সে কেবল 'মডেল'-গড়া নয়, সেই মডেলের কেবল পারিপাট্য গুণটি নিয়ে গর্ব করা নয়। মডেলের পারিপাট্য অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রসারের দিকেও নজর রাখতে হবে;

এবং এই 'প্রসারে'র অর্থই হল তার মধ্যে যাবতীয় সংশ্লিষ্ট বস্তুর অন্তর্ভাব। কিন্তু তা করতে হলে আগে থেকেই তো বস্তুগুলির স্বরূপ বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই জ্ঞান আসে বস্তুর বাস্তব বা সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ থেকে। এখন, বাস্তব প্রত্যক্ষ ব্যাপারটা 'বুদ্ধি'র কাজ নয়। সম্ভাব্য 'প্রত্যক্ষ'-ও বুদ্ধির কাজ নয়। বুদ্ধি বিষয়ের 'সামান্যতঃ' যে 'ধারণা' দেয় সেটা ঐ-বিষয়ের সম্ভাব্য 'প্রত্যক্ষ' নয়। কারণ, কেবল-বুদ্ধি-লভ্য বস্তু প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য-ও হতে পারে। 'প্রত্যক্ষ' বলতে শব্দটির সাধারণ অর্থে আমরা বুঝেছি দেশকালাবচ্ছিন্ন বা শুধু কালাবচ্ছিন্ন বা কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত প্রাকৃত বস্তুর সাক্ষাৎকার। 'সম্ভাব্য' 'প্রত্যক্ষত্বে'র অর্থ এ-ও নয় যে, বস্তুটির প্রত্যক্ষত্ব অনুমিত হয়েছে। 'সম্ভাব্য প্রত্যক্ষত্বে'র সহজ সরল অর্থ হল, বস্তুটি প্রকৃতি-রাজ্যের অন্তর্গত। কোন্ জাতীয় বস্তু প্রকৃতির অন্তর্গত এবং কোন্ জাতীয় বস্তু প্রকৃতির অন্তর্গত নয়, তা জানার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না, তৎ-তৎ-জাতীয় বস্তুর সংজ্ঞা-নির্দেশই তা ধরা পড়ে।

মডেল রচনার উদ্দেশ্যই হল প্রকৃতিগত যাবতীয় সংশ্লিষ্ট বস্তু রচিত মডেলের অন্তর্ভূত ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। কিন্তু এতেও মডেল-রচনার সব রহস্য জানা হল না। মডেল যদি প্রাকৃত জীবনেরই অন্তস্তলবর্তী হয়, অর্থাৎ যদি সেটা প্রকৃতির বাইরে থেকে আনা এবং একান্তভাবে প্রকৃতি-নিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন জিনিষ না-হয়, যদি বলতে হয় যে, যাবতীয় সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক জিনিষ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখাতেই প্রতি মডেলের সার্থকতা, তাহলে তো মডেল-রচনার পূর্বেই সেই প্রাকৃত জীবনের কিছুটা বোধ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যাই বলুন না কেন, মডেল, সেক্ষেত্রে, কোন-না-কোন ভাবে প্রাকৃত জীবনের বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অহংকারী বুদ্ধিজীবী ভুলে যান যে, তিনি ঐন্দ্রজালিকের মত শূন্য থেকে ঐ মডেলটি আহরণ করেন নি। তাঁকেও এই মর্ত্যের মাটি থেকে শুরু করতে হয়েছে। সেই মডেলে তাঁর, বা তাঁর সমাজের, প্রাকৃত জীবনের ছাপ পড়েছেই, এবং তিনি হয় এক-চক্ষু হরিণের ন্যায় সেই প্রভাব দেখতে পান নি, না-হয় ইচ্ছাকৃতভাবে তা দেখতে চান না। কিন্তু প্রভাব পড়েছেই।

ব. বি. / অনেকান্ত / ৪০-৪

মডেল এ-জাতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত, এ-কথা একমাত্র তাঁরাই বলবার অধিকারী যাঁরা যে-কোন কারণেই হোক, মনে করেন যে, আসল মৌল মডেল স্বরূপে প্রাকৃত জীবনের অন্তস্তলবর্তী নয়, যাঁদের মতে ওটা শাশ্বত অধ্যাত্ম জগতের ব্যাপার। এঁদের মধ্যে কেউ বলেন, ওটা বস্তুসৎ এবং এক জাতীয় অতিপ্রাকৃত প্রত্যক্ষের বিষয়, যার নাম অপরোক্ষানুভূতি; কেউ বা বলেন, অতিপ্রাকৃত হয়েও ওটা ব্যবহার-রীতিমাত্র, বস্তুসৎ নয়, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত ব্যবহাররীতি। উভয় পক্ষেই, মডেল স্বয়ংসম্পূর্ণ, শাশ্বত এবং সর্বতোভাবে প্রাকৃত-প্রভাব-মুক্ত।

Transcendental apriorism নামক এই মতবাদ কিন্তু অতি সহজে নস্যাৎ ক'রে দেওয়া যাবে না। আমরা দেখাব, এর মধ্যেই বুদ্ধির আসল রহস্য নিহিত আছে। সেই রহস্যের উদ্ঘাটনই হবে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলির কাজ। কিন্তু বিষয়টি আরও বিশদভাবে বুঝতে হলে তৎপূর্বে এতৎসম্পৃক্ত অন্য একটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

প্রত্যক্ষলব্ধ বা প্রত্যক্ষলভ্য যে-প্রাকৃত বস্তু বুদ্ধির উপজীব্য সেটি ঠিক কী? কেবল দেশকালে, বা কালমাত্রে, সমাহৃত ও কার্যকারণসম্পর্কে সম্পর্কিত বললেই কি তার নির্বচন শেষ হয়? বস্তুটি কি একটি নিটোল (definite) বিন্দুপরিমাণ স্বাবচ্ছিন্ন (absolutely discrete) কিছু, যাকে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অনেক সময়ে বলা হয় datum of acquaintance? এ-জাতীয় 'নিছক-পাওয়া' datum কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার কোন স্তরেই আমরা খুঁজে পাই না। পাওয়া-জিনিষ সব সময়েই অনুভূত হয় এমন এক রূপে যা অন্তর্জটিল অথচ বহিঃসরল। বাইরে থেকে মনে হয় যে, নিছক-দত্ত (just given), নিছক পাওয়া (just received), জিনিষ সরল 'এতটা'—একটা চেয়ার বা টেবিল বা মানুষ। অথচ সত্যই এরা সরল 'এতটা' নয়, কারণ এর মধ্যে অনেক-কিছু জিনিষ গ'লে মি'শে একাকার হয়ে আছে। গ'লে মি'শে একাকার যে হয়ে আছে, এ-ব্যাপারটা অবশ্য নিছক-পাওয়া অবস্থায় বুঝি না। বুঝতে পারি, যখন এক জাতীয় পুনর্দৃষ্টিতে (reflection) ঐ পূর্বতন গ'লে-মি'শে-থাকা জিনিষগুলি স্ব স্ব স্বরূপে পৃথক পৃথক ধরা পড়ে। এর পুনর্দৃষ্টি ঐ প্রাথমিক পাওয়া-অবস্থারই reflective রূপ, স্ফুটতর দ্বিতীয় স্তরীয় রূপ; প্রথম-পাওয়ার উপর বাইরে

থেকে চাপান কোন বৌদ্ধিক reflection নয়, কোন দ্বিতীয় 'পরোক্ষ' জ্ঞান নয়। এই জন্যই একে বলেছি 'পুনর্দৃষ্টি', অর্থাৎ পুনরায় ঐ একই জিনিষ আর-ও ভাল ভাবে 'পাওয়া'। এই পুনর্দৃষ্টিতে যখন ঐ-সব জিনিষ আরও ভাল ভাবে, স্ফুটতর রূপে, পাই কেবল তখনই বুঝি ঐগুলি আগেও ঐখানে ছিল—পুনর্দৃষ্টির আগে ঐ বোধ জাগে না। প্রথমে তো কিছুই বুঝি নি, সর্বপ্রথম ধরতে পারলাম পুনর্দৃষ্টিতে। এই পুনর্দৃষ্টিতে পাই তদন্তর্গত অনেক কিছু—পাই তার বিভিন্ন অংশ, পাই সেই অংশগুলি যে-রীতিতে কাঠামো-বদ্ধ হয়ে ছিল, অর্থাৎ form ইত্যাদি। এবং, যেহেতু বুঝতে পারি যে, এই সব নতুন-পাওয়া জিনিষ ঐখানে পূর্বেও ছিল অথচ ধরা পড়ে নি, তাই বলি যে, পূর্বেকার অবস্থায় এর উপরে আরও কিছু ছিল, এবং তারই নাম দিই datum, অর্থাৎ নিছক-পাওয়া জিনিষ। এটা কিন্তু শুধু 'বলা', শুধু কথার কথা, শুধু শব্দব্যবহার; কারণ প্রথম অবস্থায় এটা পাই নি তো বটেই, অধিকন্তু এর স্বকীয় আকারটা কী তা এখনও ধারণা করতে পারি না—শুধু বলি এই-রকম কিছু একটা ছিল। ফলে, এ-কথা বলারও কোন অধিকার থাকে না যে, সামগ্রিক পাওয়া-জিনিষ, তার বিভিন্ন অংশ[৪] এবং অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বাদ দিয়েও আমরা শুরু করেছিলাম অন্য এক বা একাধিক প্রাথমিক পাওয়া-জিনিষ থেকে। নিছক datum ব'লে কিছুই নেই। যে-datum নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম তা ঐ প্রাথমিক ভাবে পাওয়া 'সমগ্র'ই।

আরও একটু সাবধানে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ঐ নিটোল পাওয়া-সমগ্রটিও সত্যকারের প্রাথমিক-পাওয়া datum নয়। ওটাও আরও প্রাথমিক ভাবে পাওয়া বিস্তৃততর এক সমগ্র থেকে reflectian-এর দ্বারা বেছে-নেওয়া অংশবিশেষ, এবং ঐ বিস্তৃততর সমগ্রের বেলায়-ও ঐ একই কথা। ফলশ্রুতি, প্রকৃত প্রাথমিক-পাওয়া জিনিষ হল এক-লপ্তে পাওয়া আমার সামগ্রিক জীবন (life)। যা-কিছু ধাপে-ধাপে অগ্রসর

৪। যে-গুলি অবশ্যই শেষ অংশ নয়, কারণ যে-অংশ গুলি পরে জানি তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরিধির মধ্যে এক একটি 'সমগ্র'। পুনর্দৃষ্টি যতই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হোক, এ-জাতীয় ক্রম-ক্ষীয়মাণ 'সমগ্র' থেকে উদ্ধার নেই।

ক্রমবর্ধমান 'পুনদৃ'ষ্টি'তে পরে পরে পাওয়া যায় তারা সবই ঐ সামগ্রিক জীবনে গ'লে মি'শে একাকার হয়ে ছিল। Definite নিটোল নিছক-'পাওয়া' জিনিষ কোন কালেই ছিল না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, যে-কাঠামো বা form নিয়ে বুদ্ধির কারবার সেটাও পাওয়া গেছে পরে এবং ঐ সামগ্রিক জীবনেরই ভাল ভাবে 'পুনদ'শনে'র ফলে। এ-দিক থেকে দেখলে বলতেই হবে যে, বুদ্ধি কখনও প্রকৃতির জীবনের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

কিন্তু তা হলে কেন এক দল দার্শনিক বললেন যে, মৌলতম মডেল এবং যে-বুদ্ধি এই মডেল তৈরি করে বা দেখে বা ব্যবহার করে—এই উভয়েই অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব? আধ্যাত্মিকতা আসে কোন্ সূত্রে? কেনই বা আমরা একটু আগে বললাম যে, এই মত সহজে নস্যাৎ করা যাবে না?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দর্শনের রহস্য

(ক) গভীর রহস্য

এইখানেই দর্শনের যাবৎ রহস্য ঘনীভূত।

'জীবন' বলতে আমরা বুঝেছি মানব-জীবন। এই মানব-জীবনের আদিম রহস্যই হচ্ছে এই যে, মানুষ একাধারেই প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত। দেহ-মন-ধারী মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর মতই প্রাকৃতিক ধাতুতে গড়া এবং প্রকৃতির অনুশাসনে চলে। খাওয়া-দাওয়া থেকে আরম্ভ করে উচ্চ-স্তরের চিন্তা পর্যন্ত তার সব কাজই প্রকৃতি-নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত।[১] এদিক দিয়ে ইতর প্রাণীর সঙ্গে তার পরিমাণ (বা মাত্রা-) গত ছাড়া গুণগত কোন ভেদ নেই। অথচ, এটাও সমান সত্য যে, 'মানুষ' নামে অভিহিত প্রাকৃতিক জীবটি প্রকৃতি-রাজ্যের বাসিন্দা হয়েও সমগ্র প্রকৃতির বাইরে দাঁড়াতে পারে। প্রকৃতির বাইরে যদি সে না-দাঁড়াতে পারত, তাহলে এমনটি কী ক'রে হল যে, ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে প্রথম যেদিন মনুষ্যত্বের উন্মেষ হল সেদিন সে নির্বাক বিস্ময়ে প্রকৃতির খেলা দেখল? কেনই-বা সে ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির নানা রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হল? কেনই বা সে নব নব লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির সাজান জগৎ নতুন করে সাজাতে আরম্ভ করল? কেনই বা আধুনিক কালে সে প্রকৃতির অনুশাসন না মেনে বরং প্রকৃতিকেই শাসন করবে বলে স্থির করল? অথচ, প্রকৃতির শাসন পুরোপুরি কাটিয়ে উঠার সামর্থ্য তার নেই। প্রকৃতির মধ্যেই সে রয়েছে, যদিও সোজা হয়ে মাথা তুলে। ভাবখানা এই—তোমার কোম রকম দাসত্ব সহ্য করব না, পারলেই ছিঁড়ে বেরিয়ে যাব এবং বাইরে থেকে তোমাকেই ইচ্ছামত শাসন করব।

১। কিছু পরেই বিশদ ক'রে বলা হবে।

এই স্বাতন্ত্র্যবোধেই মানুষের বৈশিষ্ট্য, এখানেই তার মনুষ্যত্ব। বুদ্ধিতেই এই স্বাতন্ত্র্যবোধ সব চেয়ে পরিস্ফুট। তার দৈহিক ক্রিয়াকলাপ ও নিম্নস্তরীয় মনোবৃত্তি প্রায় সর্বাংশেই প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত; যেটুকু স্বাতন্ত্র্য এখানে সে প্রকাশ করতে পারে তা বুদ্ধির প্রেরণা বশেই। আসল স্বাতন্ত্র্যের প্রথম বোধ বুদ্ধিতে, এবং বুদ্ধিরই উচ্চ উচ্চতর স্তরে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ক্রমস্ফুটতা লাভ করে। বুদ্ধির উচ্চতম ভূমিতেই স্বাতন্ত্র্যবোধের পরাকাষ্ঠা। ভারতীয় শাস্ত্রমতে বুদ্ধির সেই ভূমি তত উচ্চতর যে-ভূমিতে সত্ত্বগুণের যত আপেক্ষিক প্রাধান্য। প্রকৃত পক্ষে, সত্ত্বগুণ ও স্বাতন্ত্র্য 'বোধ' একই কথা।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, বুদ্ধির উচ্চতম ভূমি পর্যন্ত এই স্বাতন্ত্র্যবোধ হল 'স্বাতন্ত্র্যের' বোধ, স্বপ্রকাশ স্বাতন্ত্র্য নয়। তার কারণ, বুদ্ধি—তা সে যতই উচ্চভূমিক হোক না কেন—নিজেই একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। এ যেন একটি আয়না যা নিজে আলো না হয়েও আলো প্রকাশ করে। অথবা, মসৃণ আয়না যেমন আলো ও না-আলোর সঙ্গমস্থল, সাত্ত্বিক বুদ্ধিতেও তেমনই স্বাতন্ত্র্য ও প্রকৃতি বিপরীত দুই দিক থেকে এসে মিলিত হয়। বুদ্ধি নিজে প্রাকৃতিক এই জন্য যে, প্রকৃতির মৌল আধার যে-দেশ-কাল অথবা শুধু কাল, বুদ্ধিও সেই আধারে আশ্রিত, এবং যে-কার্যকারণভাব প্রকৃতির প্রাণ বুদ্ধিও সেই কার্যকারণনিয়মে নিয়মিত—যে-কোন বুদ্ধিবৃত্তি নির্দিষ্ট কোন দেহবিকার বা নির্দিষ্ট কোন মনোবিকারের সঙ্গে কার্যকারণসম্পর্কে সম্পর্কিত। অতিপ্রাকৃতের প্রধান লক্ষণই হল, সে দেশ, কাল ও কার্যকারণভাব থেকে মুক্ত। এই মুক্তিরই এক নাম নেতিমূলক স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের 'ইতি'র দিকটা হল আধ্যাত্মিকতা। কোন অবস্থায়ই বুদ্ধি নিজে এই স্বাতন্ত্র্য নয়, এবং সর্ব অবস্থায়ই বুদ্ধি এই স্বাতন্ত্র্যের কমবেশি প্রকাশক।

বৌদ্ধদের মতো পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা কিন্তু প্রায়শঃই সত্ত্বপ্রধান এই বুদ্ধিকেই স্বাতন্ত্র্য বলেছেন। তাঁদের মতে বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যবোধ কোনও উদ্বৃত্ত 'স্বাতন্ত্র্যের' বোধ নয়, বুদ্ধি নিজেই স্বপ্রকাশ স্বাতন্ত্র্য। এইখানেই বেদান্তসম্মত অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য। বেদান্তসম্মত এই সব ভারতীয় দার্শনিকের মতে স্বাতন্ত্র্য নিজে অতি-

প্রাকৃত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, চরমতম বুদ্ধিরও ওপারে। আধ্যাত্মিক ব'লেই এই স্বাতন্ত্র্য, তাঁদের মতে, শাশ্বত, সত্য, অক্ষয়, অব্যয়। এই স্বাতন্ত্র্যেরই অপর নাম নিষ্কলুষ সচ্চিদানন্দ।

পূর্বেই আমরা বলেছি, যাঁরা বুদ্ধি ও বুদ্ধি-রচিত কাঠামোকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব'লে মনে করেন—তা সে বস্তুসৎ-ই হোক অথবা কেবল ব্যবহারানুগুণ হোক—তাঁদের এই মত সহজে নস্যাৎ করা যাবে না। এ-কথার তাৎপর্য এতক্ষণে বোঝা গেল। তাঁদের আসল বক্তব্য হল এই যে, স্বাতন্ত্র্য-স্বভাব বুদ্ধি তার নিজস্ব সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সমেত অতিপ্রাকৃত, তথা আধ্যাত্মিক। তাঁরা শুধু এইটুকু ভুল করেছেন—যদিও সেই ভুল সাংঘাতিক—যে, তাঁরা বুদ্ধিকে 'স্বাতন্ত্র্যের' বোধ না বলে স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ বলেছেন।

বুদ্ধিই প্রকৃতি-রাজ্যের শেষ ধাপ, যেখানে উঠলে আধ্যাত্মিকতার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, সর্বপ্রথম প্রকৃষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, 'আমি'-মানুষটার আসল তত্ত্ব, অন্ততঃ বেশ খানিকটা, প্রকৃতির শাসনের বাইরে। তত্ত্বাংশে সে চলে আপন স্বধর্মে। মৌল মনুষ্যত্বের পরিচয়ের শেষ কিন্তু এখানেই নয়। এর পরেও চলে অন্বেষণ। কেউ মনে করেন এই অধ্যাত্মরাজ্যে পৌঁছাতে হলে প্রকৃতির আকর্ষণ ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে যেতে হবে, কারণ অধ্যাত্মরাজ্য প্রকৃতি-রাজ্যের একেবারে বাইরে, প্রকৃতির নতুন এক জাতীয় প্রসার-মাত্র নয়। এঁদের মতে, বুদ্ধি-রূপ সঙ্গমস্থলেই চিদ্‌চিদ্‌গ্রন্থি নিরবশেষে ছিন্ন করতে হবে, এবং তারপর ছিন্নসূত্র বেলুনের মতো উড়ে গিয়ে পড়তে হবে ঐ চিরন্তন জ্যোতির রাজ্যে। ঐ জ্যোতিই বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত নিত্যস্থিত আত্মা, আমার মধ্যেকার আসল স্বতন্ত্র আমি—যে এতদিন আমার বুদ্ধির সঙ্গে জুড়ে ছিল, এখন ছিটকে স'রে গেল। অথবা, সে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল, বুদ্ধিই ছিটকে স'রে গেল।

অনেকের মতে এই-ই হল জীবনের পরম পুরুষার্থ। বুদ্ধিরূপ প্রকৃতির ওপারে পৌঁছান মানেই তো সুখদুঃখের সংসার পার হয়ে যাওয়া। মানুষ আর কী চায়? যদি সে এরও বেশি চায়, যদি চায় ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে, তাও সে এখানে পাবে। কারণ, দেহ মন ও বুদ্ধিকে ফেলে

আসার পরে তো আর 'তুমি-আমি-সে'র ভেদ থাকবে না, সব একাকার হয়ে গিয়ে থাকবে শুধু এক মহা-আমি[২], অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। ঈশ্বর হচ্ছেন সেই মহা-আমি যিনি তখনও-ফেলে-আসা জগৎটা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেন নি, আর ব্রহ্ম তারও উপরে; সেখানে তিনিই সব, আর কিছু নেই। মানুষ যদি এই রাজ্যে সুখ চায় তাও সে পাবে। কারণ, এখানে কোনও প্রাকৃত সুখ না থাকলেও ব্রহ্মলাভের আনুষঙ্গিক, অথবা ব্রহ্মলাভ-স্বরূপ, ভূমানন্দ আছে। মোটামুটি ভাবে এই হল শাঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তের মত।

অন্য অনেকের মতে আবার এই রাজ্যেও মানুষ তার ব্যক্তিত্ব হারায় না। একই সঙ্গে, সে ঈশ্বর-রূপ এক মহা-আমি অথবা মহা-তুমি পায় এবং নিজের পরিশোধিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-ভক্তিযুক্ত হয়ে সাদৃশ্য, সালোক্য, সামীপ্যাদি প্রাপ্ত হয়।

কেউ-বা এই রাজ্যে নিজের পরিশোধিত ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে পরে সেটাও কঞ্চুকের মতো পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মলীন হতে চান। কেউ-বা প্রকৃতি-রাজ্য ও চরম শিব-শক্তি তত্ত্বের মাঝখানে 'শুদ্ধাশুদ্ধ' ও 'শুদ্ধ' নামে দুই অধ্যাত্ম-রাজ্য মানেন এবং বলেন যে, এই মধ্যবর্তী রাজ্যদ্বয়ে পরিশোধিত ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন ভাবে বজায় থাকে—শুদ্ধাশুদ্ধ রাজ্যে রাগ-বিদ্যা-নিয়তি-কাল-কলাদি দোষলেশ সমেত, এবং শুদ্ধরাজ্যে খাঁটি সাত্ত্বিক-অহং রূপে, অথবা 'এই অহং-ই ঈশ্বর বা সদাশিব' এই বোধে। এঁরা আরও বলেন যে, এই শুদ্ধ রাজ্যের বাইরে, চরম শিব-শক্তি তত্ত্বেই সর্ববিধ ব্যক্তি-অহং কেন্দ্রিয়তার অবসান। এঁদের মতে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় এই শেষতম রাজ্যে। কেউ-বা, আবার, এতগুলি ধাপ স্বীকার না ক'রে শুদ্ধা-শুদ্ধের পরেই পরম পুরুষার্থের স্থান নির্দেশ করেন। এই অনুচ্ছেদে যে-মতবাদগুলি উল্লেখ করা হল সেগুলি হল বিভিন্ন প্রকার বৈষ্ণব ও শৈব মতবাদ—আসলে বেদান্তেরই বিভিন্ন প্রকার।

এ-সব তো হল এক দিকের কয়েকটি মৌল মতবাদ। কিন্তু অন্য দিক-ও আছে। অনেকে এই ক্রমোর্ধ্ব গতিই পছন্দ করেন না, স্বগৌরব-

২। একে মহা-তুমি বা মহা-সে অথবা মহা-অন্যকিছু বলা হচ্ছে না এই জন্য যে, এঁদের মতে এটাই তো প্রকৃত 'আমি'। পরের অনুচ্ছেদেই 'মহা-তুমি'র কথা বলা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠ এ-রকম একটা অধ্যাত্মরাজ্য অছে বলে'ই মানেন না। স্বাতন্ত্র্য ত'াদের কাছে কোনও দাঁড়িয়ে-থাকা তত্ত্ব নয়। তাঁদের 'স্বাতন্ত্র্য' পুরোপুরি ব্যবহারাত্মক। আধ্যাত্মিক পরিশীলন পথে স্বাতন্ত্র্যের ক্রমপ্রকাশের অর্থ ত'াদের কাছে এই নয় যে, উচ্চতর তত্ত্বগুলি একের পরে এক ভেসে উঠছে; আধ্যাত্মিক প্রগতির অর্থ, ত'াদের মতে, স্বাতন্ত্র্যব্যবহারে দক্ষতা অর্জন। স্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার হয় প্রকৃতি-রাজ্যেই। যেহেতু প্রকৃতির বাইরে অন্য কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ এ'রা মানেন না, অতএব স্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার তো প্রকৃতিরই যাবৎ সম্ভারের উপর হতে হবে। ব্যবহার দুই প্রকার: জ্ঞানব্যবহার ও কৃতি-রূপ ব্যবহার। প্রকৃতি-রাজ্যে স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞানব্যবহারের অর্থ হল প্রকৃতিগত তথ্যসমূহ নতুন আলোয়, স্বাতন্ত্র্য-দৃষ্টিতে, দেখা; এবং কৃতি-রূপ ব্যবহারের অর্থ হল প্রাকৃতিক বস্তুরাজির নব নব বিন্যাস-সাধন, নব নব সমাজ গঠন, স্বাতন্ত্র্যাত্মক ধর্মনীতি স্থাপন এবং ঐ ধর্মবন্ধনে মানুষের যাবৎ জৈব বৃত্তির, যাবৎ মনোবৃত্তির, সম্যক নিয়ন্ত্রণ। আধ্যাত্মিক কোন আলেয়ার পিছনে এ'রা ছোটেন না। এ'দের ব্রত প্রকৃতি-বিজয়, এবং এই ব্রতের উপকরণ হল অসীম আত্ম-সংযম, অবাধ চিত্তস্থৈর্য ও নিবাত-নিষ্কম্প প্রজ্ঞালোক। স্বাতন্ত্র্য-ব্যবহার-নিষ্পাদ্য প্রকৃতি-বিজয়েই এ'দের পরম পুরুষার্থ। এই বিজয়ের পথে সারাক্ষণই অনুরণিত হয় এক অপার্থিব আনন্দ বিভিন্ন পরিবেশে যারই বিভিন্ন নাম মৈত্রী, করুণা, প্রেম ইত্যাদি। সাধারণ ভাবে একে বৌদ্ধ মতবাদ বলা যেতে পারে। এ-জাতীয় একপ্রকার তান্ত্রিক মতবাদ-ও আছে, মূলে বোধ হয় বৌদ্ধ তন্ত্র।

এরই খুব কাছাকাছি, অথচ ভাবে ভঙ্গিতে এর সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ, আর এক মতবাদ আছে, যেখানে এরই মতো আধ্যাত্মিক আলেয়ার পিছনে নিরর্থক ছোটাছুটি করতে হয়না, যে-মতে, এরই মতো, প্রাকৃতিক জগতেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকতে হয়, এবং যে-মতে নব-উপলব্ধ স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক এই জগৎসংসারটাই নতুন ক'রে, ভাল ভাবে, সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়াই হল পরম পুরুষার্থ, অথচ যেখানে এই স্বাতন্ত্র্যের কোনও তাত্ত্বিক অভিনবত্ব একেবারেই স্বীকৃত হয় না। এই মতবাদীরা মনে করেন, বিশ্ব-বিবর্তনের পথে যেমন নিষ্প্রাণ জড় থেকে প্রাণীর আবির্ভাব, প্রাণী-জগতের মধ্যে যেমন অধিক থেকে অধিকতর অভিনবত্বের

বিকাশ, ঠিক সেই ভাবেই প্রাণী-জগতের শীর্ষস্তরে, মানুষ-রূপ আধারে, স্বাতন্ত্র্য-রূপ অভিনবতম ধর্মের উদয় হয়েছে। এঁরা আরও বলেন—এবং এইখানেই এঁদের মতবাদের বৈশিষ্ট্য—যে, বিশ্ব-বিবর্তনের পথে হঠাৎ-হঠাৎ জেগে উঠা এই জাতীয় প্রতিটি অভিনব ধর্মই নিজ নিজ জন্ম-ক্ষেত্রে সংলগ্ন থাকে—ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় না। যে-যে ক্ষেত্রে তাদের উদ্ভব তারা কেবল সেই সেই ক্ষেত্রেরই নতুন ক'রে উন্নতি সাধন করে। ফলে, শ্রেষ্ঠতম যে-অভিনবত্ব, যার নাম মানুষের স্বাতন্ত্র্য, তাকেও এই নিয়মে চলতে হবে। সে ছিঁড়ে বেরিয়ে তো যাবেই না, পরন্তু তার একমাত্র কাজ হবে, যে-জৈবভূমিতে সে জন্ম লাভ করেছে তারই সমস্ত আশা-আকাঙ্খা-(অর্থাৎ, নিছক আশা-আকাঙ্খা-) গুলি ভাল ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে, যাতে ক'রে একজনের জৈব আশা-আকাঙ্খা অন্য কারো আশা-আকাঙ্খা গ্রাস না করতে পারে। এঁরাও যাবৎ বিচ্ছেদের, যাবৎ আত্মবিরোধের চূড়ান্ত নিরসন চান। এঁরা চান, জৈব ও একান্ত-জড় জগৎটা এমন ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সুসমঞ্জস ক'রে নিতে হবে যাতে ক'রে কারো জৈব আশা-আকাঙ্খা সার্থক করার স্বাতন্ত্র্য (একেই তাঁরা মৌল অধিকার বলেন) অন্য কারো দ্বারা অবদমিত, পদপলিত, না হয়। মার্কসীয় জড়বাদীর মত মোটামুটি এই প্রকার।

এই মতবাদীরা এক দিকে স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ মর্যাদা স্বীকার ক'রেও অন্য দিক থেকে একে প্রকৃতির নাগপাশে বেঁধে রাখতে চান। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্মভূমি তো এঁদের মতে প্রাকৃত জৈব জগৎ, কাজেই অন্য সব অভিনবত্বের মতো এরও জন্মভূমির বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। তাই এঁদের নব্য জড়বাদী বলা হয়। এঁদের সঙ্গে অন্য প্রাচীনপন্থী জড়বাদীর প্রভেদ এই যে, যে-ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী জড়বাদী মনে করেন যে স্বাতন্ত্র্য লোক ঠকানো এক অবভাস-মাত্র, যার জন্য তাঁরা এটার পাশ কাটিয়ে যেতে চান, সে-ক্ষেত্রে নব্যযুগের জড়বাদীর মতে এই স্বাতন্ত্র্য জড় প্রকৃতিরই শেষ এবং সব চেয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং এই জন্যই তাঁরা এর দ্বারাই মানুষ-জগৎ—অর্থাৎ, প্রাকৃতিক সমাজ-ব্যবস্থা—পুনর্গঠিত করতে চান। প্রাচীন জড়বাদী ছাড়া আর সকলেই স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা স্বীকার করেছেন। নব্যপন্থী জড়বাদীও এই মর্যাদায় পূর্ণ আস্থা-বান। অন্যান্য স্বাতন্ত্র্যবাদীর সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এই যে, অধ্যাত্ম-

বাদীরা স্বাতন্ত্র্যবোধের উৎস সন্ধান করেন জড় প্রকৃতির বাইরে (যে জড় প্রকৃতির মধ্যে বুদ্ধিও পড়ে); স্বাতন্ত্র্যের মৌল আধ্যাত্মিকতায় তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস—তা সেই আধ্যাত্মিকতা বস্তুসৎ তত্ত্বই হোক, অথবা নিছক ব্যবহারাত্মক হোক—; পক্ষান্তরে, নব্য জড়বাদী এই স্বাতন্ত্র্যের উৎস সন্ধানে প্রকৃতির বাইরে যেতে চান না। তাঁদের মতে, আদিম প্রকৃতি প্রথম দিন থেকেই অস্ফুট ভাবে নানা আকারে এই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ ক'রে চলেছে। অদ্ভুত এক আত্মবিরোধী খেলার নেশায় জড় প্রকৃতি প্রথম দিন থেকেই নিজ-গর্ভসম্ভূত স্বাতন্ত্র্যের আলোতে নিজেরই স্বভাবগত যাবৎ অন্ধকার বিশীর্ণ ক'রে চলেছে। সেই আলোতে নিজেরই কালো দিকটা রূপবান ক'রে তোলা প্রকৃতির এক অত্যাশ্চর্য দ্বান্দ্বিক (dialectical) খেলা।

দর্শনের ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধের আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। তাদের দুই একটি বেশ মৌলিক এবং যে-সব ব্যাখ্যা নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম তাদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে সমর্থ। বাহুল্য-ভয়ে সে-সব মত এখানে উল্লেখ করা হল না।

আধ্যাত্মিক হোক বা প্রাকৃতিকই হোক, এই স্বাতন্ত্র্যই মানুষের সার-সত্য। এর নামই আসল মানুষ। এই সার-সত্য স্বরূপে পাওয়াই হল পরম পুরুষার্থ, চরম সত্য—তা সে তত্ত্বরূপ সৎ-বস্তুই হোক অথবা কেবল ব্যবহারাত্মকই হোক। অধ্যাত্মবাদীর কাছে এই সার-মানুষ দেবতার সামিল। হয় এই সার-মানুষ নিজেই দেবতা, না-হয় এর উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই দেবতা এর পাশে এসে দাঁড়ান, যেমন কোন কোন পাখী উড়তে আরম্ভ করলেই তার লেজ ও ঝুঁটির বাহার খুলে যায়। এই দেবতা আবার সব সময়ে ছোট খাটো দেবতা নন ঃ সার-মানুষটি যত বেশি উপলব্ধি করা যায় ততই তা-বড় তা-বড় দেবতা ধরা পড়েন, এবং চরমে যা পাই তা হল বিশ্বদেবতা, অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং। অদ্বৈত বেদান্তীর মতে, আবার, এঁকেও অতিক্রম করে যাওয়া যায়, এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মেলে নিরাকার নিত্যনিরঞ্জন নির্বিকার 'ব্রহ্মৈব কেবলম্'। এ-সব, অবশ্য, প্রধানতঃ বস্তুসৎ-স্বাতন্ত্র্যবাদীর কথা। কিন্তু অবস্তুসৎ-কেবল-ব্যবহারাত্মক-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা যদি আধ্যাত্মিক শ্রেণীর হন, তাহলে তাঁরাও এর কাছাকাছি কথা বলবেন। প্রভেদ এই যে, তাঁদের দেবতারা

হিমালয়ের শীর্ষচূড়ায় নিরম্বু উপবাস করে থাকেন না, এই দেবতাদের কার্যকলাপ মর্ত্য জগৎ নিয়েই, মায় ভগবান বা ব্রহ্মের ক্রিয়াকলাপ-ও।

প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য-বাদীরা কিন্তু কোনও দেবতার ধার ধারেন না। তাঁরা প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত নিজের জোরেই চলেন। স্বাতন্ত্র্যই তাঁদের জোর। আর, যাঁরা স্বাতন্ত্র্যকে মানুষের সার-সত্য ব'লে স্বীকারই করতে চান না তাঁদের কাছে জৈব-মানুষই চরম সত্য এবং এই জৈব-মানুষের দেহের দিকটাই শেষ সত্য। তাঁদের কাছে বুদ্ধির খেলাও অবাস্তব। প্রাকৃতিক বুদ্ধিটাও তাঁদের কাছে উপকরণ-মাত্র, যা দিয়ে এই জৈব-জীবনটা সুসঙ্গত করতে হয় এবং তারই উপায় হিসাবে যে-জগৎটা একান্ত জড় তাকে-ও 'কাঠামো'য় ফেলতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানানুরাগী অনেক দার্শনিক-ও বুদ্ধিকে এই দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষলব্ধ বা প্রত্যক্ষলভ্য প্রাকৃতিক জিনিষ-ই সত্যের শেষ, অন্ততঃ সত্যত্বের একটা প্রধান মাপকাঠি। অনেক বিজ্ঞানানুরাগী আবার বুদ্ধির অবাধ কার্য-কারিতায় আকৃষ্ট হয়ে "কাঠামোর মধ্যে ধ'রে ফেলা"-টাকেই সত্যত্বের শেষ মাপকাঠি বলেছেন। এঁদের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এঁরা শুধু একটি ভুল করেছেন, এবং সেই ভুলই এঁদের পক্ষে মারাত্মক হয়েছে ঃ স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিকে এঁরা স্বাতন্ত্র্য স্বরূপ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন।

(খ) আরও রহস্য

আমরা দেখিয়েছি—নির্বচন, বিশ্লেষণ, সংজ্ঞা নির্দেশ, যৌক্তিক সমর্থন এবং জানা-জিনিষ থেকে এখনও-পর্যন্ত-অজানা-জিনিষের অনুমান, যেটা শেষ পর্যন্ত 'কাঠামোয় ফেলা'র নামান্তর, এদের যে-কোনরূপে বুদ্ধি কাজ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির বিষয় হচ্ছে প্রত্যক্ষলব্ধ বা প্রত্যক্ষলভ্য প্রাকৃতিক বস্তু। এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বুদ্ধি কী করে অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান দিতে পারে? অতি-প্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য তো কোন প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়।

এ-প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, বুদ্ধির যে-কটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সেই কটি কাজের জন্যই বুদ্ধির কাছে প্রাকৃত বস্তু অপেক্ষিত, অন্য কাজের জন্য নয়। যে-কাজের দ্বারা স্বাতন্ত্র্যবোধ-রূপ বুদ্ধি স্বাতন্ত্র্যস্বরূপটি দেখিয়ে দেয় তা কিন্তু এদের একটাও নয়। মেঘের

চারপাশে সোণালী আলোর আভা যেমন সূর্যকে সরাসরি, যদিও এখনও-কিছুটা-অস্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয়, স্বাতন্ত্রবোধ-রূপ বুদ্ধিও অনুরূপ ভাবে স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ দেখিয়ে দেয়। এই সরাসরি-দেখান কাজটা নির্বচন, বিশ্লেষণ বা অনুমান, এদের কোনটাই নয়। আমার স্বাতন্ত্র্যবোধ কমবেশী স্পস্ট আকারে প্রথম থেকেই আমার থাকে ; শুধু, প্রকৃতি-সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছি বলে ওটা ধ'রে রাখতে পারি না। নানাবিধ প্রাকৃত স্বার্থের তাড়নায় প্রায়শঃই মন বিক্ষিপ্ত থাকে বলে পাওয়া-জিনিষটাও হারিয়ে ব'সে থাকি। যখন সোণালী আলোর ঝলক দেখি, তখনই তার উৎসটিও সরাসরি দেখতে পাই। তখন মনে হয় বুদ্ধির মাধ্যমে নতুন কিছু পেলাম। বস্তুতঃ নতুন কিছুই পাই না। জানা-জিনিষ থেকে অজানা-জিনিষ পাওয়া-রূপ বুদ্ধিপ্রক্রিয়া এখনে নেই। নির্বচন, সংজ্ঞানির্দেশাদি প্রক্রিয়াও নেই। কারণ, যেখানে বুদ্ধি এই সব কাজ করে সেখানে আগে থেকে কোন জিনিষ আধা-অস্পষ্ট ভাবে পাওয়া থাকে এবং বুদ্ধি তারই উপর নির্বচনাদি কাজ চালায়, অথচ বর্তমান ক্ষেত্রে আলোচ্য বুদ্ধি-কৃত্যটি সরাসরি, অতএব মোটামুটি স্পষ্ট ভাবে, উৎসটি দেখিয়ে দিয়েছে। তবুও যে নির্বচনাদির মত কিছু কাজ তার পরেও চলে ব'লে মনে হয়, সেটা হল এই সরাসরি-দেখান কাজটিরই স্ফুটতর স্বতোবিকাশ। সমস্ত ব্যাপারটা যেন এই-প্রকার ঃ স্বাতন্ত্র্য প্রথমে নিজেই নিজেকে দেখিয়ে দিল এবং তার পরে নিজেই নিজেকে স্পষ্ট করতে করতে চলল। প্রাকৃতক্রিয়াকুশল বুদ্ধি স্বাতন্ত্র্যের এই ক্রমস্ফুট আত্মপ্রকাশের প্রথম ধাপে কিছুটা সাহায্য ক'রেই খালাস।

এমন কথা বলা হচ্ছে না যে, বুদ্ধি এই স্বাতন্ত্র্যের উপর নিজস্ব ক্রিয়াকাণ্ড চালাতেই পারে না। তাই যদি হত তাহলে অধ্যাত্ম বিষয়ে কোন যৌক্তিক দর্শনের উদ্ভবই হত না। অথচ, এ-রকম যৌক্তিক দর্শন শুধু যে আছে তা নয়, অনেকের মতে এই যৌক্তিক দর্শনই আধ্যাত্মিকতার একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিবরণ। এর বাইরেকার যে-জিনিষটাকে অধ্যাত্ম-'অনুভূতি' বলা হয় সেটা, এঁদের মতে, অনেকাংশে আলো-আঁধারির ধূম্রজাল। কাজেই যৌক্তিক দর্শনের অন্ততঃ এইটুকু সার্থকতা স্বীকার করতে হবে যে, এর দ্বারাই নিগূঢ় অধ্যাত্ম-অনুভব যতটা সম্ভব পরোক্ষ ভাবে সাধারণের গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলা হয়।

কিন্তু বুদ্ধির প্রাকৃত কাজকে যদি সর্বক্ষেত্রে দেশকালাদি-বদ্ধ প্রাত্যক্ষিক বস্তুর অপেক্ষায় থাকতে হয়—যে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—তা হলে অতিপ্রাকৃত অধ্যাত্ম তত্ত্বের নির্বচনাদি কাজ সে করে কোন্ অধিকারে? উত্তর একটু বাঁকা পথ ধ'রে আসতে বাধ্য। বুদ্ধি তার প্রাকৃত কার্য-কলাপের জন্য অবশ্যই প্রাকৃত বস্তুর অপেক্ষা রাখে, কিন্তু অপেক্ষিত প্রাকৃত বস্তুটি ঘিরে যদি অতিপ্রাকৃতের কিছুটা সৌরভ, কিছুটা আভা, দিব্য স্পর্শের কিছুটা ইঙ্গিত, থেকে গিয়ে থাকে? বুদ্ধি সেটা ফেলে দিতে পারে না—সেটা যে বস্তুর গায়ে দৃঢ়সংলগ্ন। বুদ্ধি তাকে অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু ঐ গন্ধ, ঐ আভা, ঐ ইঙ্গিতের তাতে কী আসে যায়? ওরাও সঙ্গে সঙ্গে চলে। চলার পথে বুদ্ধি যেমন আরও অনেক প্রাকৃত বস্তু সংগ্রহ ক'রে আসলটার সঙ্গে জু'ড়ে জু'ড়ে চলে, তেমনই ঐ ইঙ্গিত, ঐ গন্ধ, ঐ আভাও সমগোত্রীয় আরও অনেককে সহযাত্রী ক'রে নেয়, এবং তাদের এক জাতীয় রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যাত্রাপথের শেষে তারা যে মহা-রূপ ধারণ করে, বুদ্ধির পক্ষে তা উপেক্ষা করা তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে। বুদ্ধি তখন তার জানা প্রাকৃত সংজ্ঞায় সেই মহা-রূপের নির্বচন দেবার চেষ্টা করে। পদার্থবিজ্ঞানীরা বলতে থাকেন ওটা 'conservation of matter and energy'-রূপ একটা regulative principle বা ঐ জাতীয় কিছু, যথা চাতুর্মাত্রিক দেশ, সূক্ষ্মাবয়ব প্রকৃতির অনির্দেশ্যতা, energy'র নিরবচ্ছিন্ন অবক্ষয় ইত্যাদি। জীব-বিজ্ঞানীরা বা সমাজ-বিজ্ঞানীরা ওরই নাম দিয়েছেন natural propensity for adjustment and progress। ইতিহাসবিদ বলেন, সবার অলক্ষ্যে এক মহা-নিয়ম মানব-জাতির, তথা বিশ্বের, ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁরা দেখেও দেখতে চান না, বুঝেও বোঝেন না যে, ঐ সব কথা তাঁদের প্রকৃত্যেকমুখী চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খায় না। কখনও বা তাঁরা কিছুটা রহস্য কবুল করেন, কিন্তু নিজেদের অভিমান বজায় রাখার জন্য বলেন যে, যেহেতু এই তত্ত্বগুলি মেনে নিলে প্রাকৃতিক জ্ঞানেরই সুসমঞ্জস প্রসার সাধিত হয়, এবং যেহেতু এই ধারণাগুলি কোথাও খণ্ডিত হচ্ছে না, অতএব এগুলিও 'প্রাকৃত' সত্য। আমাদের বক্তব্য—এগুলিকে যদি 'অতিপ্রাকৃত' পরিমণ্ডল বলা যায় তাহলেই বা প্রাকৃতিক জ্ঞানের সুসমঞ্জস প্রসার সাধনে বাধা কোথায়? আর সে-

ক্ষেত্রেও এদের অখণ্ডনের কোন ব্যত্যয় হয় না। তাহলে কেন এদের প্রাকৃতত্ব সাধনে এত কৃত্রিম প্রয়াস? অতএব, বলতে হবে, প্রাকৃত বস্তুই বুদ্ধির একমাত্র উপজীব্য নয়, তাদের সহভাবী অতি-প্রাকৃতেরাও সমভাবে বুদ্ধির উপজীব্য। অতিপ্রাকৃত সহভাবীরা চলার পথে সম-গোত্রীদের সমাহারে, 'তুষারগোলক'-ন্যায়ে, যখন বিরাট আকার ধারণ করে তখন সেটা-ও সমানভাবে, হয়তো বা একটু বিশেষ চমক জাগিয়ে, বুদ্ধির উপজীব্য হয়। তখন তার উপর সরাসরি বুদ্ধির ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগে বাধা কোথায়? ঐ বিপুলাকার আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল থেকেও বুদ্ধি তখন আধ্যাত্মিক সত্য অনুমান করতে পারে, অনুমিত আধ্যাত্মিক সত্যের বিবরণ ও লক্ষণ দিতে পারে, বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় তাদের ঠিক ঠিক 'যার যেথা স্থানে' সাজিয়ে রাখতে পারে। অবশ্য, বুদ্ধি-লব্ধ এই সব জ্ঞান তখন পর্যন্ত পরোক্ষ। এ-পথে অধ্যাত্ম বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ সুদূরপরাহত। অপরোক্ষ জ্ঞান তখনই হয় যখন সাত্ত্বিক প্রাকৃত বুদ্ধির শীর্ষশিখরে উঠে মানুষ অধ্যাত্ম-সত্য হঠাৎ দেখতে পায়। হয়তো, ঠিক তখনই অধ্যাত্ম-সত্য থেকে অনুগ্রহ-প্রসাদও নেমে আসে। কিন্তু আমার 'দেখতে পাওয়া'-টাই এক্ষেত্রে বড় কথা।

বেশ অনেকে বলেন যে, পরোক্ষ যৌক্তিক জ্ঞানের পরোক্ষ বিষয় নিয়ে যদি আমি অবিচল চিত্তে ধ্যান ক'রে যেতে পারি, তাহলে একদিন হঠাৎ সেটা মূর্তপ্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেবে। যতটা সহজ ভাবে কথাটা বলা হয় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা দুরূহ হয়ে উঠে; তবে ওর রহস্য-ভেদ প্রয়োজন।

আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলটা 'তুষারগোলক'-ন্যায়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যখন বিশাল আকার ধারণ করে তখনই সেটা বুদ্ধির নজরে আসে এবং তখনই তাকে নিয়ে বুদ্ধির লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড শুরু হয়। তার মানে হল, তখনই সেটা প্রত্যক্ষে আধা ধরা পড়েছে। তার অনেকটা অবশ্য এখনও প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, প্রত্যক্ষ'লভ্য'। কিন্তু প্রত্যক্ষলভ্যকে তো প্রত্যক্ষ-লব্ধের সমজাতীয় হতে হবে। পরন্তু, এখানে প্রত্যক্ষলব্ধ বস্তুটা কোথায়? বলতেই হবে যে, বুদ্ধির কাজ সবে যখন সুরু হয়েছিল তখনই প্রাকৃত বস্তুর চতুষ্পার্শ্বস্থ অতিপ্রাকৃত আভা, গন্ধ, স্পর্শ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এখন বুদ্ধির শেষ পর্যায়ে এসে আধ্যাত্মিকের বিশাল

আকারটি তদ্‌গোত্রীয় ব'লেই প্রত্যক্ষ'লভ্য' বলতে পারছি। এই ভাবে 'পূর্বস্বীকৃত' এই প্রত্যক্ষলভ্যতার জন্যই অবিচল ধ্যানে ওটা প্রত্যক্ষ-'লব্ধ' হবে বলতে পারি, নচেৎ ও-কথা বলতেই পারতাম না। কথাটা এই ভাবে বুঝলে আর দুরূহত্ব থাকে না।

একটা সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা বোঝান যায়। অনেক সময়েই কোন পাওয়া জিনিষের বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা একটা প্রকল্প (hypothesis) রচনা করি, অর্থাৎ বস্তুটা কেন ঠিক এই-রকম হয়েছে বা ঘটেছে, সেই কারণটা যেন কল্পনার চোখে দেখতে পাই। সেটাকে অবশ্য বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। কিন্তু মিলিয়ে নেবার আগেও বুদ্ধি নিজের প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ প্রকল্পের গুণাগুণ বিচার ক'রে নিতে বাধ্য থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকল্পটি গুণাগুণ-বিচারের আগেই রচিত হয়, না ঐ বিচার-ক্রিয়া-ব্যাপী সমগ্র কালটি ধরে ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠে? সম্ভাবনা দুটি কিন্তু মূলতঃ একই। প্রথম থেকেই একটা আকার প্রায়-অযাচিত ভাবে জেগে উঠে, এবং বুদ্ধি তাকেই কাটছাঁট ক'রে কখনও বা নতুন কিছু জু'ড়ে, ঐ আকারটা ঠিকমতো গ্রহণযোগ্য ক'রে নেয়। তাই যদি হয়, তাহলে তো বলতে হবে বুদ্ধিপ্রক্রিয়া-প্রয়োগের আগেই আকারটি হাজির হয়েছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, কোথা থেকে এল, কে ওটা গড়ল, কে নিয়ে এল? বুদ্ধি নিজে ওকে আনে নি। সাধারণ প্রাকৃত প্রত্যক্ষে-ও ওকে পাওয়া যায় নি। কল্পনা (imagination) ওকে গড়েছে বললে প্রায় কিছুই বলা হল না, কারণ কল্পনা জিনিষটা কী তাই ভাল ক'রে বোঝা যায় না। তা-ছাড়া, অতটা প্রকল্প গ'ড়ে তোলার সময়-ই বা কল্পনা পেল কখন? প্রকল্পটা তো হঠাৎ এক নিমেষে এসে হাজির হয়েছে। কল্পনা ব্যাপারটা আগাগোড়াই রহস্যময়।

সচরাচর ধরা হয়, বুদ্ধিই ওটা গ'ড়ে নিয়েছে, যদিও প্রাথমিক অবস্থায় তাকে কল্পনার সাহায্য নিতে হয়েছে—কল্পনা যেন বুদ্ধির দোসর। এ-ব্যাখ্যা কিন্তু একটা বিরাট গোঁজামিল। বুদ্ধি প্রাথমিক প্রকল্পের উপর খোদকারি করতে পারে, খবরদারি করতে পারে, কিন্তু তার জন্ম দেয় না। এই বোধটুকু আছে ব'লেই বোধ হয় সব দিক সামলান'র জন্য বলা হয় 'কল্পনার সাহায্য নিয়েছে'। কিন্তু কল্পনা জিনিষটা কী,

তাই তো জানা নেই। একটা রহস্যের ব্যাখ্যা আর একটা রহস্য দিয়ে হয় না। প্রকল্প, অবশ্য, দু-রকমের হতে পারে। এক-রকম প্রকল্প হল প্রাণহীন, বাধ্যতামূলক এবং স্বীকৃত্যাত্মক—ব্যাখ্যার জন্য ঠিক যেটুকু প্রয়োজন বুদ্ধিই সেটা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে (mechanically) নিজ নিয়মে সামান্যাকারে খাড়া ক'রে নেয়। আমরা কিন্তু সে-জাতীয় প্রকল্পের কথা বলছি না। আমাদের বিচার্য প্রকল্প হল সেই জাতীয় যা হঠাৎ-ই তার দোষগুণ নিয়ে উপস্থিত হয়।

এই জাতীয় প্রকল্প হঠাৎ-ই এসে হাজির হয়, এবং সর্বস্তরেই আসে বুদ্ধির তৎ-তৎ-স্তরীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে, যে-স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। বুদ্ধির নিচু দিকের স্তরে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ চিত্তমালিন্যের প্রভাবে, নানাবিধ সঙ্কীর্ণ জৈব-স্বার্থের চাপে, চাপা প'ড়ে থাকে। চিত্ত যত নির্মল হয়, স্বার্থবুদ্ধি যত ক'মে আসে, বুদ্ধি যত সত্ত্বপ্রধান হয়ে উঠে, স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ততই প্রকৃষ্ট-প্রকাশ হয় ; প্রকৃতির খাঁজে খাঁজে যে অতিপ্রাকৃত রহস্যের খেলা চলে এই স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিই সেগুলি উদ্ঘাটিত করে।[৩] সাধারণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই-জাতীয় রহস্য প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়ে থাকে, প্রথমে চোখে পড়ে না, পরে পড়ে। কিন্তু সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে যে-অতিপ্রাকৃত সত্য প্রকাশিত হয় তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রকৃতির সঙ্গে জু'ড়ে থাকার কোন বাধ্যবাধকতা তার নেই—এই যা বিশেষ। সর্বক্ষেত্রেই অতিপ্রাকৃত রহস্যের উদ্ঘাটন নির্ভর করে স্বার্থবুদ্ধিমুক্ত আমার চিত্ত কতটা নির্মল হয়েছে, তার উপর। বুদ্ধির যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে এর কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

তবে কেন বলা হয়, যান্ত্রিক বুদ্ধির সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণ অতিপ্রাকৃতের যে পরোক্ষ জ্ঞান হয় তারই বিষয়ের উপর অবিচল ধ্যানের ফলে ঐ অতিপ্রাকৃত এক সময়ে প্রত্যক্ষগোচর হবে ? আমরাই বা কেন ইতিপূর্বে বলেছি যে, এই মত একান্ত ভ্রান্ত নয়, এর পিছনেও একটা

৩। Science যাকে Natural Law বলে সে-জিনিষটাও মূলে অতিপ্রাকৃত, যদিও তার বর্ণনা দিতে হয় প্রাকৃতিক ভাষায়। Natural Law, তথা সমগ্র কার্যকারণ-নিয়মটাই, প্রকৃতিগত জিনিষপত্র বা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সমপর্যায়ী নয়। এই জন্যই আধুনিক 'philosophy of Science'-এর স্বরূপনির্ণয়ে এত মতভেদ।

সত্য লুকিয়ে আছে? বলেছি এই জন্য যে, কিছু-পরিমাণ চিত্তশুদ্ধি না-হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধির ক্রিয়াকলাপের সুষ্ঠু প্রয়োগই হয় না, অথবা তাঁরাই এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ-কুশল যাঁদের চিত্তশুদ্ধি আগেই ঘটেছে। বুদ্ধির প্রয়োগের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে কি না জানি না, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না-হওয়া পর্যন্ত যে বুদ্ধির সম্যক প্রয়োগ হয় না, এ-কথা তো বিজ্ঞান-সমাদৃতও বটে। 'বিজ্ঞানী'রা বলেছেন. যতক্ষণ পর্যন্ত personal equation সম্পূর্ণ অপসৃত না হচ্ছে ততক্ষণ, যুক্তি কেন, প্রত্যক্ষাদি সব জ্ঞানই দোষযুক্ত থেকে যায়। অধ্যাত্মের খবর রাখেন-না বলে তাঁরা অবশ্য এ-কথাও বলেছেন যে. personal equation কখনই পুরোপুরি দূর হয় না; এর কুফল থেকে দূরে থাকবার জন্য তাঁরা অন্য অনেক প্রক্রিয়ার কথা তুলেছেন। তাঁরা যদি অধ্যাত্মতত্ত্ব মানতেন এবং স্বীকার করতেন যে, আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্য চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন, তাহলে যোগশাস্ত্র-সম্মত নিরবশেষ চিত্তশুদ্ধির সম্ভাব্যতাও তাঁরা মানতে পারতেন।[৪]

এই নিরবশেষ চিত্তশুদ্ধি-অর্জনই খাঁটি আধ্যাত্মিকতা লাভের এক-মাত্র উপায়। কেবল মননে, অথবা মননের পরে নিদিধ্যাসনে, কিছুই লাভ হয় না যদি-না মননের সঙ্গে সঙ্গে, অথবা তৎপূর্বে, অথবা তৎ-পূর্বভূত শ্রবণেরও আগে চিত্তশুদ্ধি অর্জন করা হয়ে থাকে। যাঁরা বলেন মননোত্তর নিদিধ্যাসনের ফলে অধ্যাত্মের সাক্ষাৎকার হয় তাঁরা কিন্তু সকলেই স্বীকার করেছেন যে, যৌক্তিক মনন, এমন-কি তারও পূর্বেকার শ্রবণের আগেই সব অধ্যাত্মান্বেষীই অন্ততঃ বহিরঙ্গ যোগপ্রক্রিয়ায় অনেকখানি চিত্তশুদ্ধি অর্জন করেছেন। বাকি যে-টুকু প্রয়োজন সেটা তাঁরা নিদিধ্যাসনে পুষিয়ে নেন।

৪॥ নিরবশেষ চিত্তশুদ্ধি কখনই অর্জন করা যাবে না—এ-কথা স্বীকার করলেও, আদর্শ (regulative ideal) হিসাবে এটা মানতে আপত্তি কোথায়?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মৌলিক একান্ত-দর্শনাবলীর হিসাব

এতক্ষণ যতগুলি একান্ত দর্শনের কথা বলা হল তাদের মোটামুটি হিসাব এই :

১। অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিকতা না-মানা। একে বলে জড়বাদ। এই জড়বাদের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

(ক) তথাকথিত অতিপ্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক হল প্রাকৃত বিভিন্ন বস্তুর এক জাতীয় রাসায়নিক মিশ্র (সংশ্লেষ), যা প্রাকৃত বস্তুর পিছনে পিছনে ছায়ার মতো চলে, এবং যার দিকে নজর দেবার কোনই সার্থকতা নেই। প্রাচীন জড়বাদীদের এই মত।

(খ) অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতিরই গর্ভসম্ভূত, যদিও আপাতদৃষ্টে দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদের মতো ও জন্মদাত্রীর বিরুদ্ধাচারী। প্রত্যুতঃ স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতিবিরোধী নয়। প্রকৃতিই এই স্বাধীন আত্মজকে নিজের ঘর গোছাবার কাজে লাগান এবং তাতে প্রকৃতিরই আত্মোন্নতি ঘটে। বিরোধী আত্মজ-ও জনয়িত্রীর উন্নতিবিধানে মুখ্য সহায়ক হয়ে তৃপ্তি লাভ করে। এটাই মোটামুটি নব্য জড়বাদ, যার নাম Marxism।

(গ) চিন্তারাজ্যের ইতিহাসে আর এক জাতীয় জড়বাদ প্রায়শঃই দেখা যায়। তৃতীয় দলভুক্ত এই জড়বাদীরা অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ নিয়ে মাথা ঘামান না। স্বরূপতঃ এই-জাতীয় স্বাতন্ত্র্য তাঁদের মতে হয় অবস্তুসৎ, না-হয় সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। এঁরা কিন্তু স্বাতন্ত্র্য'বোধ'-রূপ বুদ্ধি স্বীকার করেন, অর্থাৎ এঁদের মতে বুদ্ধিই স্বতন্ত্র। এই বুদ্ধি হয় নিজেই প্রাকৃত বস্তুবিশেষ, না-হয় অবস্তুসৎ ব্যবহার-মাত্র। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ এবং প্রাচীন empiricist-রা প্রথম বিকল্পে বিশ্বাসী। দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করেছেন 'Critique of Pure Reason'-বিলাসী কান্ট্রিয়-গণ এবং

অনেক অতি-আধুনিক empiricist। এঁদের সকলেরই মতে—বস্তুতঃ, নির্বিশেষে সব দার্শনিকের মতে—প্রাকৃত বস্তু হল তাই যা দেশকাল বা কেবলকাল-বদ্ধ এবং যা কার্যকারণ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত।

২। জড়বাদের বিরোধী হল অধ্যাত্মবাদ। অধ্যাত্মবাদীর মতে, আধ্যাত্মিক সত্য দেহ মন ও বুদ্ধি সমেত সমগ্র জড় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত মানুষের মৌল স্বাতন্ত্র্য। প্রকৃতিরাজ্যের অন্তর্ভূত হয়েও প্রকৃতির বাইরে থাকার এই স্বাতন্ত্র্য কেবল মানুষেরই আছে। এই স্বাতন্ত্র্য চার দল দার্শনিক চার ভাবে বুঝেছেন।

(ক) এক দল এ-কে কোনও 'দাঁড়া' (substantive) সত্য বলতে চান না। প্রকৃতির বাইরে প্রকৃতি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত কোন আধ্যাত্মিক রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের যাবতীয় তথ্য আমাকে অনুসন্ধান করতে হবে, অনুসন্ধানান্তর উচ্চ-নীচ ন্যায়ে ; অথবা যে-কোন পদ্ধতিতে, পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখিয়ে তাদের সুসমঞ্জস ভাবে সাজাতে হবে—এ-সব প্রশ্ন তাঁদের কাছে একেবারে অবাস্তব। নব্য জড়বাদীদের মতো তাঁরাও এই স্বাতন্ত্র্য-ব্যাপারটিকে ব্যবহারাত্মক-মাত্র মনে করেন, এবং এর দ্বারা তাঁরা প্রকৃতিকেই নতুন ভাবে সাজাতে চান। এই দৃষ্টিতে তাঁরা প্রকৃতিকে নতুন ভাবে সাজান ব'লে 'দেখেন', অথবা নতুন ভাবে সাজিয়ে প্রকৃতির সৌষ্ঠব 'সম্পাদন করেন', অথবা উভয় কাজই করেন। স্বাতন্ত্র্য এঁদের কাছে অস্বীকৃত নয়, অথচ এমন একটা জিনিষ যার সম্বন্ধে 'আছে' বা 'নেই', 'আছে' এবং 'নেই' অথবা 'আছেও-না এবং নেইও-না', কোন কথাই বলা যায় না। এটা শুধু ব্যবহার করতে হয়। মহাযান বৌদ্ধদের মতবাদ অনেকটা এইরূপ।

(খ) দ্বিতীয় এক দলের দার্শনিক ঠিক এক বিপরীত কথা বলেন। তাঁদের মতে স্বাতন্ত্র্য বা অতিপ্রাকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ব একটা পৃথক জগৎ এবং একেবারেই প্রকৃতির বাইরে, অর্থাৎ অ-দেশকালিক এবং প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণমুক্ত। প্রকৃতিতে এর কোনই উপযোগ নেই। এর জগৎ একে-বারে আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ। মানুষের পরম পুরুষার্থ হল এই জগৎ-স্থ হওয়া। চরম সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধি-রূপ শেষ প্রাকৃত ধাপ পার হয়ে মানুষ যে-মুহূর্তে এই জগতে উত্তীর্ণ হয়, সে দেখে আমি-তুমি বা আমি-জগৎ (প্রাকৃত জগৎ)-এ কোনও ভেদ নেই। কোথাও কোনও ভেদ নেই,

সব একাকার, সব নির্বিশেষ স্বাতন্ত্র্য-মাত্র, যার শাস্ত্রীয় নাম 'ব্রহ্ম'। তখন যে-প্রাকৃত জগৎ সে ফে'লে এসেছে তার কাছে সেটার আর কোন সত্তা থাকে না, এমন-কি একটা অস্পষ্ট ছায়ার আকারেও সে-জগৎ তার কাছে থাকে না। হয়তো প্রাকৃত জগৎ থেকে শেষ উত্তরণের অব্যবহিত পরে ক্ষণকালের জন্য জগৎটা তার কাছে ছায়ার মতো প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সে-ছায়া জগৎ-রূপ কায়ার অভাবে স্বতঃই বিশীর্ণ হয়ে পড়ে। সে-ছায়া স্বাতন্ত্র্যের ছায়া-ও নয়। স্বাতন্ত্র্যের-ও ছায়া পড়া সম্ভব ছিল যদি কেউ তার স্বপ্রকাশ জ্যোতি আবৃত ক'রে রাখত। কিন্তু 'হিরণ্ময় পাত্রের' আবরণ তো আগেই 'অপাবৃত' হয়েছে। 'একটা আবরণ ছিল' ব'লে এখন কোন স্মৃতিও নেই, কেননা সব স্মৃতিরূপ বোধ তো ফে'লে আসা হয়েছে। আগে তাহলে জগৎটা কী ক'রে ছিল, এবং আমি-ই বা কেন সেই জগতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে নিজেকে প্রাকৃত জীব মনে করছিলাম—এ-জাতীয় প্রশ্ন এখন তার কাছে নেই। ঘুম থেকে উ'ঠে, সহজ সুস্থ মনে (authentically), কেউ এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় না—কেন আমি এতক্ষণ এই এই স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্নের সব কথা ঝেড়ে ফে'লে দিয়ে সে আবার সর্বান্তঃকরণে সাংসারিক কাজ-কর্মে আত্মনিয়োগ করে—এবং জীবনের ঠিক সেইক্ষণটি থেকে লাইন টেনে, যে-ক্ষণে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝখানের স্বপ্ন-জগৎটা তার জীবন থেকে নিঃশব্দে খ'সে যায়, তার জীবন-প্রবাহে একটি নগণ্য তরঙ্গ-ও উঠে না। বাইরে থেকে, স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় 'তথাকথিত-শিক্ষিত' (sophisticated) বুদ্ধি, যে-বুদ্ধি ফাঁক-বিহীন প্রাকৃত জীবনের মধ্য থেকেও ক্রমাগত—এবং নির্বিশেষে ছোট বড় সব ব্যাপারেই—স্বাতন্ত্র্যের খেলা দেখায়। 'খেলা' বলছি এই জন্য যে, এ-জাতীয় অনেক ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য-ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন, তবুও স্বাতন্ত্র্য জিনিষটার এমনই আত্মমোহ যে, কারণে অকারণে সব সময়েই সে নিজের অস্তিত্ব তারস্বরে ঘোষণা করতে চায়। স্বপ্নের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক বুঝতে চায় বুদ্ধিগর্বিত মানুষ —অধিকাংশ সময়ে অকারণে, কখনও-বা প্রাকৃতিক জীবনের 'বিজ্ঞানী'-রূপে। সহজ সুস্থ প্রাকৃতিক জীবন যাপনে এ-সব প্রশ্নের বালাই নেই। তদ্রূপ, ব্রহ্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ কী, কেন ব্রহ্ম প্রকৃতি-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, অথবা প্রকৃতি ব্রহ্মের তুল্যমূল্য অন্য এক সত্য কি না এবং

কেন ব্রহ্ম এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চেয়েছিলেন, ব্রহ্মাস্বাদীর কাছে এ-সব প্রশ্নই নেই। একমাত্র ব্রহ্মই সব। ব্রহ্মের পাশে প্রকৃতি, অথবা 'অঘটনঘটনসংঘটনপটিয়সী মায়া', ব'লে কিছুই নেই। যদি কেউ প্রশ্ন করেন—সিংহ-বিবরে প্রবেশের পথরেখা রয়েছে, কিন্তু নিষ্ক্রমণের পথ-রেখা কই? তাহলে এঁদের সহজ সরল উত্তর হল, নিষ্ক্রমণের প্রয়োজনই নেই, তাই পথরেখাও নির্দিষ্ট হয় নি। এই হল শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্ত মত।

(গ) এই মতের কাছাকাছি, কিন্তু অনেকাংশে ভিন্ন, আর একটি মতবাদ আছে, যে-মতবাদীর কাছে প্রকৃতি-রাজ্যের শেষ ধাপ উত্তরণের ফলে যে-অধ্যাত্মরাজ্যে আমরা প্রবেশ করি সেখানে সব একাকার নয়। স্বাতন্ত্র্য সেখানে অন্ততঃ দ্বিমূর্তিক। সেখানে প্রধানতঃ আমি-রূপ ব্যক্তি বিশেষের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধ হয়, কিন্তু তার নিত্যসহভাবীরূপে আর এক মহাস্বাতন্ত্র্য-ও উপলব্ধ হয়, যার নাম ঈশ্বর। এই মহা-স্বাতন্ত্র্য শুদ্ধ 'ব্যক্তি-আমি'র সহভাবী হলেও তাঁর অসীম মহত্বের কারণেই তিনি অন্য যত শুদ্ধ-আমি আছে—অর্থাৎ শুদ্ধ-আমি, শুদ্ধ-তুমি, শুদ্ধ-সে—সকলেরই নিত্য-সহভাবী। আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যজগতে আছে অনন্তসংখ্যক শুদ্ধ আত্মা এবং সমভাবে সকলেরই সহভাবী এক মহান্ আত্মা, যার নাম ঈশ্বর, এবং সেখানে এই সব শুদ্ধ আত্মা ঐ মহান্ আত্মার সহভাবিত্বে পরস্পর-সমৃদ্ধ। এঁদের মতে, এরা এবং ঐ মহান্ আত্মা একাকার হয়ে থাকে না, অথচ একাকারত্বের উপান্তভাবী এক জাতীয় প্রায়-একত্ব সম্পর্ক থাকে প্রতিটি শুদ্ধ আত্মা ও মহান্ আত্মার মধ্যে, এবং কিছুটা পৃথক ধরণের প্রায়-একত্ব থাকে শুদ্ধ আত্মাদের নিজেদের মধ্যে। এই প্রায়-একত্ব এক অতি-নিকট সম্পর্ক তত্ত্বতঃ যার নাম 'অপৃথক্‌সিদ্ধি' এবং সাধনরূপে যাকে বলা হয় ভক্তি বা প্রেম। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা মোটামুটি এই মতাবলম্বী। অদ্বৈতবেদান্তীর কাছে অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্যাবস্থায় ভক্তি বা প্রেমের অবকাশ নেই, কারণ ভেদ সেখানে দূরাপাস্ত। তাঁর কাছে ঐ একই কারণে কর্মে'র-ও অবকাশ নেই। এ-সব তো ভেদদুষ্ট প্রকৃতি-রাজ্যের ব্যাপার, যা ফে'লে আসা হয়েছে। এখানে আছে শুধু জ্ঞান—তাও এমন এক-প্রকার জ্ঞান, 'অমুক বিষয়ের জ্ঞান' ব'লে-ও যার নির্বচন হয় না। বলা হয়েছে, এ-জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ। ভক্তি, প্রেম বা কর্ম' যদি ভক্তিস্বরূপ

প্রেমস্বরূপ বা কর্মস্বরূপ হত তাহলে অদ্বৈত স্বাতন্ত্র্যকে হয়তো তাও বলা যেতে পারত। কিন্তু সেটা বড় দুরূহ ব্যাপার। কোন কোন অদ্বৈতী, অবশ্য, চরম স্বাতন্ত্র্যকে ভক্তিস্বরূপ বা প্রেমস্বরূপ বলেছেন, এবং অনেক বৈষ্ণব-ও চরমে প্রেমস্বরূপ মেনেছেন। মোটামুটিভাবে, এগুলি কিন্তু ব্যতিক্রম।

(ঘ) অতি-প্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য পদার্থটি যাঁদের মতে জগৎ-নিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্বরূপ আধ্যাত্মিক বস্তু, তাঁদের মধ্যে আর একটি বিশাল দল আছে যাঁরা কিন্তু কেবল এতেই খুশি না হয়ে এর সঙ্গে প্রাকৃত জগতের একপ্রকার সম্পর্কের কথা বলতে চান, যে সম্পর্কে এই স্বাতন্ত্র্য জগৎ-সাপেক্ষ না হয়েও জগতের নিয়ামক ও উন্নতিবিধায়ক। অদ্বৈত-বেদান্তের সঙ্গে এঁদের মতের মূলতঃ প্রভেদ এই যে, এঁরা প্রাকৃত জগৎকে অবস্তুসৎ বা ছায়াবৎ মনে করেন না। অবশ্য, এঁদের মতেও প্রাকৃত জগৎ অতিপ্রাকৃত-নিরপেক্ষ নয়, প্রাকৃত জগৎ অতিপ্রাকৃত তত্ত্ব-জগৎ থেকেই আত্মলাভ করেছে এবং অতিপ্রাকৃত তত্ত্বাবলীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে প্রাকৃত জগৎ মিথ্যা নয়। অতিপ্রাকৃত জগতে চরম তত্ত্ব যে-ব্রহ্ম তিনি তাঁর একাত্মভূত অথচ তাঁর থেকে কথঞ্চিৎ ভিন্ন কোনশক্তি দ্বারাই, সত্য-রূপে হোক অথবা মিথ্যা-রূপেই হোক, ঈশ্বর-রূপ ধারণ ক'রে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। প্রাকৃত জগৎ সত্য কি মিথ্যা, তা নির্ভর করে বিভিন্ন দার্শনিক শক্তির ঐ কথঞ্চিৎ ভিন্নতাটি কী ভাবে দেখতে চেয়েছেন তার উপর। শাঙ্কর বেদান্তী মনে করেন যে, যেহেতু ঐ শক্তি আগা-গোড়াই স্ববিরোধ-দুষ্ট, অতএব ওটা মিথ্যা ; এবং ফলে ঐ শক্তি-সম্ভূত এই প্রাকৃত জগৎ-ও মিথ্যা। কিন্তু এখন আমরা যে-সব দার্শনিকের কথা বলতে চাইছি তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন যে, ঐ ঐকাত্ম্য (তাদাত্ম্য)-দাবি নিরবশেষ ঐক্যের দাবি নয়। তাঁদের মতে, এখানে 'ঐক্য' শব্দের অর্থ হল পিতা-পুত্র, আত্মা-দেহ, বিশেষ্য-বিশেষণের মতো এমন একটি অতি-নিকট সম্পর্ক যেখানে ভেদ অস্বীকৃত নয়। ভেদের মধ্যে যে 'এক' তা হল ঐ যাবতীয় ভেদের অন্তর্যামী একান্ত সার বস্তু, যা ঐ সমগ্র ভেদের নিয়ন্তা, যা ওদের সকলকেই ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখেছে। 'বেঁধে রেখেছে'—এ-কথা ঠিক, কিন্তু এটাও ঠিক যে স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ উদ্বোধ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ সেটা দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না।

স্বাতন্ত্র্যের চরম বোধে যখন ব্যাপারটা ধরা পড়ে তখন সে কেবল এইটুকু দেখে না যে, যাবতীয় ভেদ ঐ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ; যারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত তাদের-ও সে দেখে। ভেদাভেদ-বাদী অন্য এক দল আবার সমস্ত জিনিষটাই একটু অন্য ভাবে দেখতে চান। তাঁদের মতে চরম ভেদাভেদ এক অবিশ্লেষ্য সত্য। চরমে যখন ভেদাভেদের সাক্ষাৎ প্রতীতি হয় তখন তার মধ্যে এইগুলি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু এবং তারা এই নির্দিষ্ট বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ—এ-প্রকার কোন প্রকৃষ্টবোধ জাগে না ; অবিভাজ্য একটি মাত্র বোধ থাকে, যে-বোধ ভেদ ও অভেদ পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়েও অ-বিলীন। এই বোধের নামই, তাঁদের মতে, ভক্তি বা প্রেম।

আবার, এঁদেরই তৃতীয় একটি দল বলেন, চরম ঐক্য 'অর্থাৎ চরম ব্রহ্মকে, স্বরূপেও ধরা যায় অথচ স্বরূপে-ধরা কালেই দেখতে পাওয়া যায় তিনি ভেদপ্রসূ-ও বটে। এটাই তাঁর বিচিত্র স্বভাব। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণসত্তাক হয়েও তিনি বিচিত্র বিভেদের-ও সৃষ্টি করেন, এবং ঐ সমস্ত বৈচিত্র্য ধারণ ক'রেও থাকেন। সৃষ্টির পূর্বেও ঐ বৈচিত্র্য তাঁর মধ্যে ছিল, কিন্তু অপ্রকট ভাবে ; সৃষ্টির পরেও তারা থাকে তাঁর মধ্যে, যদিও তখন প্রকটস্বরূপ হয়ে। এই শেষ তিন উপদলের মধ্যে প্রথম দুই উপদলের দার্শনিকেরা বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য ব্যাপারটা মূলতঃ ভক্তির দিক থেকে দেখেন, যদিও তাঁদের কেউ কেউ ওটা জ্ঞানলব্ধ বলে মানতেও অরাজি নন। তৃতীয় উপদল কিন্তু মূলতঃ জ্ঞানপন্থী।

(খ) চতুর্থ উপদল

চতুর্থ একটি বিরাট উপদল আছে যে-উপদলের দার্শনিকেরা মূলতঃ জ্ঞানপন্থী অথচ যাঁরা বলেন যে, জ্ঞান পথের উর্ধ্ব দেশে যখন শিব-স্বরূপ কেবল-ব্রহ্মকে· পাওয়া যায় তখন সে-জ্ঞান 'পূর্ণজ্ঞান' নয়, কারণ সে-প্রক্রিয়ায় 'পূর্ণ' ব্রহ্মকে পাওয়া যায় নি। পূর্ণব্রহ্ম তো কেবল নিজ-সত্তাবান নন। তাঁর স্বভাবের মধ্যেই আছে যে, সদাশিব হয়েও তিনি ঈশ্বর রূপে জীব ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন। নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকা তো অপূর্ণতা, তা যতই না কেন স্বরূপোলব্ধি হোক। পূর্ণ-স্বভাব তিনি দেহমনধারী জীব সৃষ্টি করেন, দেহ-মন-ধারী জীব সৃষ্টির পূর্বে কেবল-

মন-ধারী ও তৎপূর্বে কেবল-ব্যক্তিত্ব-ধারী শুদ্ধ আত্মা সৃষ্টি করেন।[১] এই সব শুদ্ধ আত্মা ও জীব সৃষ্টি হয় তাঁরই সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য-খেলায় যোগদানের জন্য। এই সব টুকরো টুকরো স্বাতন্ত্র্য তাঁরই মহা-স্বাতন্ত্র্যের অংশ, এবং প্রতিটি অংশের ব্যক্তিত্ব রক্ষার খাতিরে তিনি সেগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণপ্রতিম ক'রেই গড়েন। এ-যেন মহা-স্বাতন্ত্র্য-সমুদ্রে নিমজ্জিত এক একটি ছোট বড় কলস যার প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে চারিদিকে-বেড়া-দেওয়া এক একটি ছোট বড় জল-জগৎ। এমন এক একটি জল-জগৎ যেগুলি মহাসমুদ্র থেকে তুলে নিলেও তারা নিজেদের এক জাতীয় সত্তা বজায় রাখে। এই যে এক জাতীয় সত্তা তারা বজায় রেখেছে ব'লে মনে করে তার মধ্যে কিন্তু লুকিয়ে আছে এক বিরাট ভ্রান্তি, যার নাম অজ্ঞান। সে যখন নিজেকে আলাদা ক'রে দেখে তখন ভুলে যায় যে, কলসস্থ জল মহাসমুদ্রেরই জল। সে-জল নিশ্চয়ই বস্তুসৎ—এমন কি ব্যক্তি-জল হিসাবেও—কিন্তু আখেরে সেটা তো মহাসমুদ্রের জল ছাড়া অন্য জল নয়। সে-জল মহাসমুদ্রের জলেরই অংশবিশেষ। মহাসমুদ্রের জল থেকে ভিন্ন অন্য জল বলে সেটা প্রতীয়মান হয় চারিদিকের বেড়াজালের জন্য। এই বেড়াজাল রূপ উপাধির ফলেই কলস-জলের মিথ্যা স্ব-সত্তা। মিথ্যা মাত্রই পরিত্যজ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এখানে যেটা পরিত্যজ্য তা হল কেবল মহাসমুদ্রজল-ভিন্নত্ব, অংশের ব্যক্তিসত্তা নয়, অংশের সত্তা-মাত্র তো নয়ই। শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্ত এই ব্যক্তি-সত্তারও নিরসন চায়। কিন্তু এঁদের মতে তার প্রয়োজন নেই। মহাজল-ও যেমন সত্য, তার অংশগুলি-ও সমান সত্য। ব্যাপারটা আরও ভাল ক'রে বোঝা যায় যদি জগতের প্রতি ব্যক্তি-জলকে ইংরাজী ভাষার 'material noun'-বাচ্য মহাজলের দৃষ্টান্তবিশেষ রূপে দেখা হয়। এ-ভাবে দেখলে স্ব-সত্তাবান প্রতিটি ব্যক্তি-জলকে তো সত্য-ই বলতে হয়। তদ্রূপ মহাসমুদ্র-জলের প্রতিটি অংশ-ও। প্রভেদ এই যে, মহাসমুদ্র-জলের ক্ষেত্রে অংশগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকে এবং সেই ব্যক্তি-জলগুলিকে অংশ বলা হয়; পক্ষান্তরে, 'material noun'-বাচ্য মহাজলের দৃষ্টান্তগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন

১। সর্বক্ষেত্রেই জীব-সৃষ্টির অর্থ শক্তির মাধ্যমে নিজেরই বহুকরণ। সেই শক্তির কখনও শুদ্ধ মায়া, কখনও অশুদ্ধ মায়া বা প্রকৃতি। প্রকৃতি আবার মহাভূতসৃষ্টি কালে তত্ত্বান্তরে পরিণত হন এবং তখনই (স্থূল) দেহধারী জীব সৃষ্ট হয়।

তাই তাদের বলি 'দৃষ্টান্ত'। অথচ, মনে রাখতে হবে, এই দৃষ্টান্তগুলি 'abstract noun'-বাচ্য 'জলত্বে'র দৃষ্টান্ত নয়। 'Material noun'-এর সঙ্গে abstract noun'-এর প্রভেদই এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে তথাকথিত দৃষ্টান্ত 'অংশে'রই সমগোত্রীয়—কেবল, অংশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, এই যা বিশেষ। যাই হোক্, এই চতুর্থ মতে অংশের ব্যক্তিসত্তা মিথ্যা ব্যাপার নয়। মিথ্যা ব্যাপার হল অংশী থেকে অংশ বিচ্ছিন্ন করে দেখা।[২] ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, পরম ব্রহ্ম স্ব-স্বভাবেই নিজ অংশাবলীর যথার্থ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেন, আপনাকে বহুরূপে সত্য-সত্যই দাঁড় করান।

চতুর্থ মতগত রহস্যের শেষ কিন্তু এখানেই নয়। বলা যেতে পারে, এই মিথ্যা-ও তিনি সৃষ্টি করেন, যদিও মিথ্যারূপে। মিথ্যা ব্যক্তি-আত্মা কর্তৃক 'সৃষ্ট' নয়। ঈশ্বর বা তৎ-সন্নদ্ধ মায়া ব্যক্তি-আধারে মিথ্যা সৃষ্টি করেন। কী অবলম্বন ক'রে ব্যক্তি-আত্মা মিথ্যা সৃষ্টি করবে? বেড়াজাল রূপ উপাধির মাধ্যমেই কলস-জলের মিথ্যা বিচ্ছিন্নতা অনুভূত হয়। কিন্তু ব্যক্তি-আত্মা যে-বেড়াজালের মাধ্যমে নিজের মিথ্যা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে তাও যে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মসৃষ্ট, অথবা ব্রহ্মসন্নদ্ধশক্তি-সৃষ্ট। ব্রহ্ম, অথবা ব্রহ্ম-সন্নদ্ধ শক্তিই, যেমন ব্যক্তি-আত্মা সৃষ্টি করেন, অন্য দিকে তেমন-ই প্রতি ধাপে বিভিন্ন উপাধি-ও সৃষ্টি ক'রে চলেন। ব্যক্তি-আত্মা সৃষ্টির সমকালেই তিনি বিদ্যা, কাল, নিয়তি, কলা, রাগ প্রভৃতি-ও সৃষ্টি করেছেন, যেগুলির মাধ্যমেই প্রতিটি ব্যক্তি-আত্মা নিজেকে ব্রহ্ম-বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরুষ মনে করে। পরের ধাপে সৃষ্ট হয়েছে মন বা বুদ্ধি, তার পরের ধাপে দেহ ও দেহ-সংলগ্ন ভৌতিক জগৎ। এগুলির পরিধির মধ্যেই পুরুষ পরিণত হয় প্রাকৃত মানুষে; আবার, এগুলির মাধ্যমেই প্রাকৃত মানুষ নিজেদের ব্রহ্ম-বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করে।

[অদ্বৈতবেদান্তীর মতো এঁরাও সব সৃষ্টিকে কালিক মনে করেন না। অপ্রাকৃত রাজ্যে 'সৃষ্টি' শব্দের মৌল অর্থ হল function—এক তত্ত্ব অপর এক তত্ত্বের ভাষায় বোদ্ধব্য হবার যোগ্যতা। একমাত্র প্রাকৃত পদার্থই কালে সৃষ্ট হয়। তাও এমন কথা নয় যে, প্রথম যে প্রাকৃত

২। বিচ্ছিন্ন হয়ে 'থাকা' নয়। এই মতবাদীদের মতে ভ্রান্তি কেবল জীবাশ্রয়ী, বস্তু-জগতে ভ্রান্তি বলে কিছু নেই, অর্থাৎ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোনও ভ্রান্তি নেই। বলা বাহুল্য, শাঙ্কর অদ্বৈতীর মতে ঈশ্বর-দৃষ্টিও ভ্রান্ত।

পদার্থ সেটা সর্বপ্রথম কালে সৃষ্ট হয়েছে, তার আগে কাল বলে কিছু ছিল না। এ-কথার অর্থই বোঝা যায় না। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—কাল পদার্থটাই এমন যা অতিপ্রাকৃতে প্রাকৃত রূপ দেয়। অকালিক নিত্য (অর্থাৎ metaphysical) তত্ত্বের ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কাবলীর কালিক রূপ ধারণই হল কালিক সৃষ্টি। কালের সহভাবী হল কার্য-কারণসম্পর্ক, যার পারিভাষিক নাম 'নিয়তি'। অপ্রাকৃতকে প্রথম প্রাকৃত রূপে দেখাই শুদ্ধাশুদ্ধ জগতের কলা ও বিদ্যা।]

মিথ্যা স্বাধিকারের কী প্রয়োজন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে এঁরা বলেন, তা না থাকলে ব্যক্তি-আত্মা, বা ব্যক্তি-মানবের, করণীয় কিছুই থাকত না, 'তার ব্যক্তিত্ব থাকা এবং না-থাকা সমান কথাই হত। সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলেই সেই কলসজল দিয়ে কত কাজ করা যায়। অথচ ভুললে চলবে না যে, সব জলেরই শেষ গতি সেই মহা-সমুদ্র যেখান থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। ব্যক্তি-আত্মা যদি নিজেকে কেবল ব্রহ্মের অংশ-বিশেষ মনে ক'রে থাকত তা হলে ব্রহ্মের সঙ্গে শুধু অংশাংশী সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে প'ড়ে থাকা ছাড়া, অথবা কেবল তদুপযোগী পূজা-প্রেমাদি কৃত্যে মগ্ন হয়ে ব্রহ্মাস্বাদ গ্রহণ করা ছাড়া, তার আর কোন কাজ থাকত না। তাতে অবশ্য তার নিজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হত না, ঈপ্সিতব্য সবই সে পেয়ে যেত। কিন্তু তাতে তার, কিংবা তার পরমারাধ্য ব্রহ্মের, কি 'পূর্ণতা' লাভ হত? সবই যদি শুধু ভাল হত, সবই যদি কেবল আনন্দ হত, তাহলে মন্দের স্থান থাকত কোথায়, দুঃখ-পাপ কার অধিকারে থাকত? এগুলি তো তাহলে ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী এক মহাদানবের একচ্ছত্র অধিকারে চলে যেত। প্রাকৃত মানুষের কাজ কি তাহলে এই হত যে, তাকে যে-ভাবেই হোক, মহাদানবটির পাশ কাটিয়ে ব্রহ্মাধিকারে পৌঁছাতে হবে? কিন্তু মহাদানব তো তার ফলে নিঃশেষে ধ্বংস হত না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধক হয়তো তার অত্যাচার থেকে কৌশলে মুক্তি লাভে সমর্থ হত, কিন্তু ব্রহ্মসৃষ্ট বাকিরা যে-তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে থাকত। ধরে নিলাম, তারাও শাস্ত্রবিহিত কৃত্যাদি অবলম্বনে কোন এক কালে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু তা হলেও তো সব সমস্যার সমাধান হয় না। ব্রহ্মের পাশাপাশি এই মহাদানব তো

তার শক্তি ও অধিকার নিয়ে থেকে যেত। জানি না, সে ব্রহ্ম-রাজ্যের বহিঃপ্রাকারে ক্রমাগত আঘাত ক'রে সেই রাজ্যের বাসিন্দাদের নিদ্রা-সুখের ব্যাঘাত ঘটাত কি না ; কিন্তু এ-টুকু নিশ্চিত যে, ব্রহ্মের সর্বাধিপত্য থাকত না। ফলে, অংশতঃ পঙ্গু এই ব্রহ্মের পূর্ণতার হানি হত। পূর্ণতাখ্যাতিবাদীরা এই জন্যই ব্রহ্মের বাইরে কিছু ফে'লে রাখতে চান না। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য সবই তাঁদের মতে ব্রহ্মসৃষ্ট এবং ব্রহ্মান্তর্গত। পূর্ণতাখ্যাতি-দর্শনে তথাকথিত মনুষ্য-কর্তৃক-সৃষ্টিকে-ও, অর্থাৎ যাবৎ মিথ্যা, দুঃখ, মন্দ ও পাপকে-ও, ব্রহ্মের সৃষ্টি বলা হয়েছে—ব্রহ্ম কেন এ-সব সৃষ্টি করলেন তা না বলতে পারলেও। কেন সৃষ্টি করলেন—এ-প্রশ্নের উত্তর এই চতুর্থ উপদল-ভুক্ত দার্শনিকেরা দিয়েছেন, এবং উত্তরটা বিলক্ষণ 'জুতসই'-ও হয়েছে। এঁরা বলেছেন :

(১) এই সব মিথ্যা, মন্দ, দুঃখ ও পাপের মূলে রয়েছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কলসস্থ জলের ব্যক্তিসত্তার ন্যায় সত্য, অতএব নিঃসংশয়ে ব্রহ্মসৃষ্ট।

(২) এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ব্রহ্মবিচ্ছিন্নতাবোধ-রূপ বাড়তি যে-গুণটি আগাগোড়াই মিথ্যা তাও কিন্তু ব্রহ্মসৃষ্ট, কেননা তারই সুষ্ঠু ব্যবহারে এই মিথ্যাকে জয় করতে হয়। ব্রহ্মবিচ্ছিন্নতা-বোধ রূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ব্যবহারে মানুষ যেমন স্বার্থসিদ্ধি-মানসে অনাসৃষ্টির পত্তন করে, তেমন-ই তার দোষ দর্শনের ফলে বিপরীত মুখে সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার ক'রেই স্বকৃত অনাসৃষ্টি সে দূর করে ; এবং, শুধু তাই নয়, যে-বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যবোধ ঐ অনাসৃষ্টির মূল তা-ও সে জয় করে। জয় করার পদ্ধতি হল নিরাসক্তি যোগ—নিরাসক্ত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, মূলতঃ নিরাসক্ত জ্ঞান। দেহ-মন-আত্মক-স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে-স্বাতন্ত্র্যবোধ তা সে ব্যবহার করে নিঃস্বার্থ ভাবে। অবশ্য, এক লাফেই সে চরম নিঃস্বার্থতা লাভ করতে পারে না। তাকে বৈরাগ্য ও পরার্থতা (বা দেবার্থতা) অভ্যাস করতে হয়। "চিত্তনদী উভয়তো বাহিনী বহতি পাপায় চ বহতি কল্যাণায় চ।" যে-অজ্ঞান তাকে বন্ধের মধ্যে এনে ফেলেছে সেই অজ্ঞানেরই বিপরীত-প্রক্রিয়ায় ক্রম-নিষ্পাদ্য নিঃস্বার্থ জ্ঞান লাভ, নিষ্কাম কর্ম ও অহেতুকী ভক্তি দ্বারা সে প্রাকৃত জগৎ জয় করতে শেখে। তাকে কোনও কিছু পাশ কাটিয়ে যেতে হয় না, নিজের স্বার্থ সে অন্য

সকলের এমন কি দেবতাদের এবং, শেষ পর্যন্ত, ব্রহ্মের—স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ বসিয়ে রাখতে শেখে। এই ভাবে সাজান মানেই হল সত্য-দৃষ্টিতে সব দেখা। সাধন-মার্গে ক্রমবিকাশ্য সত্যধারা প্রথমে functionally কাজ করে, অর্থাৎ সাধক প্রথম দিকে আধা-উপলব্ধ সত্য কেবল ব্যবহার করে। পরে যেমন যেমন সত্য সে উপলব্ধি করে তেমন-ই সেই সেই উপলব্ধ সত্য আবার ব্যবহার করে। অধিকন্তু প্রতি ধাপে কিছু সত্য উপলব্ধি হওয়া-মাত্রই তদূর্ধ্ব সত্যের-ও আধা-উপলব্ধি হয়, এবং তখন সে ঐ আধা-উপলব্ধ সত্যের ব্যবহারের মাধ্যমে আবার সব প্রাকৃত ও পূর্বোপলব্ধ সত্যসমূহ যথাযথ সাজায়। এই ভাবেই তার সিদ্ধি ও সাধন সম্পাদিত হয়। কিছু বাদ না দিয়ে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত সব সত্যই যথাযথ সাজিয়ে এক মহাসত্যের উপলব্ধি হয় ব'লে, এবং সেই ক্রমবিকাশ্য মহাসত্যের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার চলে ব'লে, এই চতুর্থ মতবাদটির নাম দেওয়া হয়েছে 'পূর্ণতা দর্শন'। এই মতে প্রয়োজন-মতো ভক্তির খেলাও স্বীকৃত হয়।[৩]

চতুর্থ পরিচ্ছেদে অধ্যাত্মবাদ প্রসঙ্গে যে-চারটি অবান্তর ভেদের কথা আলোচনা করা হল তাদের প্রত্যেকটিরই অন্তর্গত আরও উপমত আছে, এবং ঐ চারটি অবান্তর ভেদ ছাড়া আরও অবান্তর ভেদ আছে। বাহুল্য-ভয়ে সেগুলি আলোচনা করা হল না।[৪]

৩। খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রথম পরিচ্ছেদের শেষদিকে আমরা 'সত্যের ক্রমবিকাশ'-রূপ যে-মতটি অগ্রাহ্য করেছি বর্তমান পূর্ণতাখ্যাতিবাদের সঙ্গে তার কিছুই মিল নেই।

৪। যথা, মাধ্ব মতবাদ বা পাশ্চাত্যের theism একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। অথচ আমরা তা আলোচনা করলাম না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৌলিক মতবাদ-বিষয়ক সমালোচনা-পদ্ধতি

(ক) বিবিধ প্রাসঙ্গিক সমস্যা

চতুর্থ পরিচ্ছেদে যে-সব মৌল মতবাদ তালিকা-ভুক্ত করা হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্যই হল তারা প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিজ নিজ পরিধির মধ্যে সুসমঞ্জস। প্রত্যেকটি মতই এক একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন। মানব-জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদানই যদি দর্শনের কাজ হয়, তাহলে বলতেই হবে প্রতিটি মতবাদ সে-কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। প্রতিটি মত প্রতিটি অন্য মত থেকে ভিন্ন কেবল এই জন্য যে, প্রতিটির মূলীভূত দৃষ্টি, প্রতিটির মৌল ভিত্তিভূমি বিভিন্ন। এদের তুলনামূলক সমালোচনার কোন অর্থই হয় না যদি-না সমালোচক মৌলদৃষ্টিগুলির, মৌল ভিত্তি-ভূমিগুলির, বৈশাদৃশ্য স্পষ্ট ভাবে দেখান। ঐ বৈসাদৃশ্য সূক্ষ্ম ভাবে দেখান ছাড়া তাঁর আর কী কাজ থাকতে পারে বোঝা দুষ্কর। মূলগত পার্থক্য সম্যক ভাবে ফুটিয়ে না তুলে যদি জীবনের বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যানভূত এই মতবাদগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করা হয় তাহলে সেটা নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াস হবে, এতে সন্দেহ নেই। ব্যাখ্যার অর্থই তো হল, প্রতি মতটির মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে দেখা। প্রতিটি ব্যাখ্যাই তো নিজ নিজ মূল ভিত্তিভূমির উপর স্থাপিত। সেখান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অনুরূপ বিচ্ছিন্ন অন্য একটি মতবাদের প্রেক্ষিতে তার গুণাগুণ বিচার হতে পারে না। বিচার-প্রহসন চলতে পারে। কিন্তু তাতেও অশান্তি এই যে সে-প্রহসন শেষ হবার লক্ষণ থাকে না। শূন্যাকাশে মল্লযুদ্ধ চললে প্রতি পক্ষই প্রতিপক্ষীকে অবাধে বিভিন্ন দিক থেকে আঘাত ক'রে চলে। মাটির বুকে যুদ্ধ চললে মাটিই তাদের গতিবিধি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ ক'রে দেয়—অন্ততঃ

ঊর্ধ্বগমন ও অধোগমন নিষিদ্ধ থাকে। প্রশ্ন হতে পারে—বিভিন্ন নিয়মকানুনের দ্বারা কি আকাশযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না? উত্তর সহজ : মল্লযুদ্ধের ক্ষেত্রে সব নিয়মকানুনই বাইরে থেকে চাপান, মল্লেরা তা মানেন—এই যা বিশেষ ; না মানলেও প্রদর্শনী-বহির্ভূত অবৈধ যুদ্ধ চলতে পারে। কিন্তু তর্কযুদ্ধের ক্ষেত্রে এটা কি একান্ত অভিপ্রেত নয় যে যুদ্ধ এক সময়ে থামবে? থামাটা, অর্থাৎ যুদ্ধের মীমাংসা, যদি অভিপ্রেত হয়, তাহলে তো 'নিয়মকানুনগুলি বাইরে থেকে চাপান' এ-কথা বলা যাবে না। সামাজিক সৌষ্ঠবের খাতিরে জোর ক'রে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে কি দার্শনিক মীমাংসা হয়? যাঁরা নিয়মগুলি মানেন, কেবল তাঁদেরই থামতে হয়। কিন্তু এমন অনেকে থাকতে পারেন যাঁরা ঐ সব নিয়ম মানেন না, এবং অনেক ক্ষেত্রে এমন অঘটন-ও ঘটে যেখানে যোদ্ধারা শেষ পর্যন্ত নিয়মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার এমন ব্যাপার ঘটে যে, সম্মুখ তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়েও আমি প্রতিপক্ষের কথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারি না। এই 'বিকার' যে সব সময়েই চিত্তের অশুদ্ধির জন্য ঘটে তা নাও হতে পারে : কট্টর নৈয়ায়িক-ও স্বীকার করেছেন যে, অনেক সময়ে মূলে অনুভূতি-দ্বৈধের জন্য এমন ব্যাপার ঘটে। কাজেই, যে-ভাবে হোক, সেই মৌলিক প্রশ্নটাই এসে দাঁড়ায়—অনুভূতির সঙ্গে তর্কনীতির কী সম্পর্ক? তর্কনীতির একান্ত বৈধতা তখনই মেনে নেওয়া যায় যখন হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তর্কনীতি-বোধও একপ্রকার মৌল অনুভূতি, অথবা যে মৌল দৃষ্টিতে আমি জীবনটা দেখছি—যে ভিত্তি-ভূমির উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি—তর্কনীতি তৎসঞ্জাত-ও বটে, বাইরে থেকে চাপান একটা সামাজিক, এমন-কি বিশ্ব সামাজিক প্রথা-মাত্র নয়।

তর্কনীতি বুদ্ধির-ই ক্রিয়াভঙ্গি। এই বুদ্ধিই তো প্রাথমিক বা প্রায়-প্রাথমিক স্বাতন্ত্র্যবোধ। অতএব, সমগ্র তর্কনীতি বুদ্ধিরই সহোদর, একেবারে যমজ—এমন কথাও বলা যায়। সবটাই তাহলে দাঁড়াচ্ছে মৌল বা প্রায়-মৌল অনুভবের উপর। আসল কথাই তাহলে হল মৌল বা প্রায়-মৌল দৃষ্টি এবং ভিত্তিভূমি, যারই অপর নাম উচ্চতম বুদ্ধি। 'প্রায়'—এই বিশেষণ যোগ করা হচ্ছে এই জন্য যে, অনেক দার্শনিক বুদ্ধির-ও ঊর্ধ্বতন 'স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ' মানেন। যাঁরা তা মানেন না তাঁদের

মতে উচ্চতম বুদ্ধির দৃষ্টিই মৌল দৃষ্টি, মৌল স্বাতন্ত্র্য; যাঁরা মানেন তাঁদের কাছে এটা প্রায়-মৌল।

অতএব দেখা যাচ্ছে, একেবারে মূল ধরে টান না দিলে বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যার পারস্পরিক তুলনা বা গুণাগুণ বিচার সার্থক হয় না। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের কৃত্রিম Quixotic জগতে, মূল পর্যন্ত না গিয়েও, এক রকম খেলা দেখিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাতে জীবন-সমস্যার সমাধান হয় না।

মানলাম, মূলে যেতে হবে। কিন্তু মৌল দৃষ্টি, মৌল ভিত্তিভূমি তো একাধিক, এবং প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে—প্রতিটি ভিত্তিভূমির উপর—তো এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন গ'ড়ে উঠেছে। মীমাংসা তা হলে হবে কোন্ সূত্র ধরে? একমাত্র উত্তর হল—প্রত্যেকটিই যুক্তিসহ, প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অতএব প্রত্যেকটিই গ্রহণ'যোগ্য', অর্থাৎ অন্ততঃ অস্বীকৃত—গ্রহণযোগ্য, একথা মেনে নেওয়া।

কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, ভাল ক'রে বোঝা ঠিক ততটা কঠিন। প্রাসঙ্গিক একাধিক সমস্যার সমাধান না হলে ভাল ক'রে বোঝা-ই যাবে না। সমস্যাগুলি এই ঃ

(১) বিভিন্ন মতবাদগুলি তো অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর-বিরোধী। তাহলে সব কটিই গ্রহণযোগ্য হবে কী ক'রে?

(২) যদি বা পরস্পর-অবিরোধী মতগুলি সব কটিই গ্রহণযোগ্য হয়, সব কটি একসঙ্গে নিয়ে আমি জীবনযাত্রা নির্বাহ করব কী ক'রে? এদের মধ্যে কি একটা প্রধান এবং অন্যগুলি স্বতঃই অপ্রধান হয়ে থাকবে না? তা হলে সব কটিই সমান ভাবে মৌল হবে কী প্রকারে? সমভাবে মৌল মনে ক'রে গ্রহণ করলে জীবন উন্মথিত হয়ে যাবে না?

(৩) মতবাদগুলির নির্বচন কালেই কি দেখান হয় নি যে, একদল দার্শনিক অন্য এক দলের তুলনায় বেশি এগিয়ে গেছেন? অতিপ্রাকৃত-স্বাতন্ত্র্য-বাদী কি প্রাকৃত-স্বাতন্ত্র্য-বাদীর চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে যান নি? তাতেই কি প্রমাণিত হয় নি যে, অতিপ্রাকৃত-স্বাতন্ত্র্য-বাদ প্রাকৃত-স্বাতন্ত্র্য-বাদের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য? তদ্রূপ, নব্য জড়বাদ প্রাচীন জড়বাদের তুলনায়?

(৪) এই মতবাদগুলির সব কটি, অথবা একাধিক কয়েকটি, সমান গ্রহণযোগ্য মনে করার অর্থ এই নয় কি যে, এদের-ও অতীত এক শ্রেয়স্তর মতবাদ আছে, যারই বিচিত্র অব-মূর্তি বা বিভিন্ন 'অবান্তর' প্রকাশ হচ্ছে এই মতবাদগুলি ?

সমস্যাগুলির একে একে সমাধান প্রয়োজন।

প্রথম সমস্যার সমাধান : অবশ্যই, মৌল মতবাদগুলির বেশ কয়েকটি একে অপরের বিরোধী। কিন্তু তাতে তাদের প্রত্যেকটিকে গ্রহণ-'যোগ্য' বলতে বাধা কোথায় ? বিরোধ উপস্থিত হলে অবশ্যই তার নিরসন করতে হয়—এতো বুদ্ধির স্বাভাবিক কাজ। কিন্তু যদি শত সৎ-চেষ্টা সত্ত্বে নিরসন না হয় ? সমস্যা-মাত্রেই একপ্রকার বিরোধ, এবং সমস্যা-সমাধানের অর্থই হল বিরোধ-নিরাস। জীবনের নানা মৌলিক ও আধা-মৌলিক সমস্যার সমাধান-প্রয়াসেই দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব। দর্শন তো ক্রমশঃই বিরোধ নিরসন ক'রে চলেছে। চলতে চলতে যদি এক জায়গায় পৌঁছে দেখে যে, আর এগোন যাচ্ছে না, যদি দেখে সে এখন যে সমস্যা, যে-বিরোধের, সম্মুখীন হয়েছে সেগুলি একেবারে মূলগত, তাহলে তার আর কী করণীয় থাকতে পারে ? এই বিরোধ-ও যদি সে দূর করতে সমর্থ হত, নিশ্চয়ই সেটা হত সর্বোত্তম। কিন্তু এখানে তো সে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এখন পারছে না, পরে হয়তো সে এই বিরোধেরও নিরসন করতে পারবে, এ-কথা বলার কোন অর্থ হয় না। কী যুক্তিতে এই কথা বলা যায় ? যেহেতু এটাও বিরোধ এবং বিরোধ-মাত্রই নিরসনার্হ, এই যুক্তিতে ? কিন্তু এ-দৈববাণী মানুষ কবে শুনল ? জীবনের মূল্যে মানুষ বোঝে যে বিরোধ অতিক্রম করতে হয়, বিনা যুদ্ধে বিরোধ, স্বীকার ক'রে নিলে অশেষ ক্লেশ ভোগ করতে হয়। এই জন্যই মানুষ বিরোধ চায় না। কিন্তু বিরোধের সঙ্গে সে কী-জাতীয় লড়াই করে ? কখন সে বিরোধীকে সমূলে নাশ করে, কখন-ও বা বিরোধীর চাপে আত্মসমীক্ষায় রত হয় এবং বোঝে সে নিজেই ভুল করেছিল, ফলে নিজের মত পরিত্যাগ ক'রে বিরোধী মতটাই যথার্থ ব'লে গ্রহণ করে, কখন-ও বা আবার 'কিছু দেওয়া কিছু নেওয়ার' মাধ্যমে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হয়, কখন-ও বা বিরুদ্ধ মতদ্বয় একটা বৃহত্তর মতের

সহকারী 'অবান্তর' দুই মত ব'লে বোঝে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিরোধ উপস্থিত হলে যা সকলের অভিপ্রেত তা হল বিরোধের 'অবসান', নিরসন নয়, এবং এই অবসানের পদ্ধতি অনেকবিধ! অনেক সময় লড়াই চালিয়ে যাওয়াও এক জাতের অবসান, কেননা লড়াই চালিয়ে যাওয়াটা যদি স্বভাবে পরিণত করতে পারি তাহলে বিরোধের ক্লেশদায়ক অনুভূতি আর থাকে না—একটা রজোগুণাত্মক শক্তির চাপে বিরোধ বিরোধ-রূপেই মাথা নত করে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে কি অনেক সময় বিপক্ষ সেনানীরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না? বিরোধ ততক্ষণই আত্মাবমাননা-কর, অতএব হেয়, যতক্ষণ সে আমাকে অভিভূত ক'রে রাখে, যতক্ষণ তার প্রতাপে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট থাকি। সেই জন্যই যেন তেন প্রকারে ঐ বিরোধের মোকাবিলা করতে চাই। উদ্যতফণা অহিরাজের সামনে পড়লে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ি ব'লেই হয় তার পাশ কাটিয়ে পলায়ন করতে চাই, না-হয় ভয়সঞ্জাত ক্রোধের বশে তার বিনাশে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু স্থিরচিত্তে যদি এই অসহ অবস্থার অবসান চাই, তাহলে অন্য পথ গ্রহণ করতে হয়। সর্বোত্তম অন্য পথ হল প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান। অহিরাজের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান নিঃসন্দেহে অতি দুরূহ। কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়।

জীবনসমস্যার ক্রমলব্ধ সমাধান পথে যদি চরমে এমন এক অবস্থায় আসতে হয় যেখানে আমার মৌল দৃষ্টি ও মৌল ভিত্তির সামনে থাকে আর কয়েকটি মৌল দৃষ্টি ও মৌল ভিত্তি—যেগুলি সমবলবান, যাদের বিনাশ সম্ভব নয়, যেগুলি এড়িয়ে যাওয়া একান্ত দুষ্কর, যাদের আরও বড় একটা দৃষ্টির অন্তর্গত অথবা বিস্তৃততর অন্য এক ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না—সেক্ষেত্রে প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানই একমাত্র পথ। এই পথ গ্রহণ করার নামই হল স্বীকার করা যে, প্রতিটি মতই গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান : প্রতিটি মতই গ্রহণযোগ্য, এ-কথা স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, সব কটি মতই—অন্তত: যে-কটি মত পরস্পর-বিরোধী নয় তাদের—আমি সত্য সত্যই গ্রহণ, অর্থাৎ 'স্বীকৃতগ্রহণ' করব। একটি মত সত্য সত্যই গ্রহণ করা এবং কেবল গ্রহণ-'যোগ্য' মনে করা—এ-দুয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। গ্রহণ-'যোগ্য' বলি শুধু এই কটি কারণে যে, (ক) মতটি নিজ পরিধির মধ্যে দোষত্রুটিশূন্য,

(খ) মতটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং (গ) মতটির দ্বারা জীবনের সর্ব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, যদিও এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে যে-দৃষ্টিকোণ আমার নয়। হয়তো বা আরও এই কারণে যে, একদল লোক তো এই মতবাদ সত্য সত্যই গ্রহণ করেছে, যদিও আমি ওটা সত্য সত্যই গ্রহণ করি নি।

'সত্য সত্যই গ্রহণ করা'র অর্থ আত্মসাৎ করা, তদনুযায়ী আমার জীবন পরিচালনা করা, মতটির সহিত আমার জীবনের ঐকাত্ম্য সম্পাদন। বিশ্বজগতের এক 'সম্ভাব্য' রূপ স্বীকার করা মাত্র নয়, জীবনের এক 'সম্ভাব্য' কাহিনী-মাত্র নয়। 'সত্য সত্যই গ্রহণ', অর্থাৎ স্বীকৃতগ্রহণ-এর অর্থ অকপটে স্বীকার করা যে, বিশ্বজগৎ প্রকৃতই এই প্রকার, আমি বিশ্বজগৎকে প্রকৃতই এই ভাবে দেখি এবং যেহেতু এই-দেখার মধ্যে কোন দোষত্রুটি নেই, অতএব চিরকালই এই ভাবে দেখব, আমার জীবনটাকে ঠিক এই ভাবে চালিয়ে যাব। ইংরাজীতে একেই বলে commitment। প্রথম পরিচ্ছেদে একেই আমরা বলেছি 'স্বীকৃতগ্রহণ'। পক্ষান্তরে, 'গ্রহণযোগ্যতা' বা 'অস্বীকৃত-গ্রহণ'-এর ইংরাজী নাম admitting a legitimate possibility। মার্কিন-সোভিয়েত আঁতাতের অর্থ হল, মার্কিনী সোভিয়েতীদের বলছে : তোমার দেশে তোমার জীবনযাত্রায় আমি বাধা দেব না, তুমি-ও আমার দেশে আমার জীবনযাত্রায় বাধা দেবে না ; তোমার মত আমার ঘাড়ে চাপাবে না ; আমার মত-ও তোমার ঘাড়ে চাপাব না ; আমরা স্ব স্ব-পরিধি সীমিত পরস্পরের মতবাদ পরস্পর শ্রদ্ধা ক'রে যাব ; এবং সোভিয়েতী-ও মার্কিনীকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। মৌল দার্শনিক মতবাদগুলির বেলায়-ও ঐ একই কথা। এই যে পার-স্পরিক সহন ও শ্রদ্ধা, এটা কেবল যে পরস্পর-অবিরুদ্ধ মতবাদগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, তা নয় ; পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদের ক্ষেত্রে-ও এর প্রয়োগে বাধা কোথায়? মার্কিনী ও সোভিয়েতী মতবাদ কি পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়?

দার্শনিকগণ যখন নিজ নিজ মতের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন মত আলোচনা ক'রে তার দোষত্রুটি উদ্ভাবন করেন তখন তাঁদের চিন্তাধারা দুই খাতে প্রবাহিত হতে পারে। কোন কোন সময় তাঁরা ভুলে থাকেন যে, তাঁদের নিজের মতটা একটা সত্য সত্যই গৃহীত, অর্থাৎ, 'স্বীকৃত-গৃহীত', মত। তাঁরা সে-সময়ে সেটাকেও সম্ভাব্যের পর্যায়ে তুলে ধ'রে সম্পূর্ণ

নির্লিপ্ত ভাবে অন্য সম্ভাব্য মতের সঙ্গে তার তুলনামূলক সমালোচনা করেন এবং প্রতি মতের-ই দোষগুণ সমদৃষ্টিতে বিচার করেন। অনেক সময়ে, আবার, নিজের মতটি "আঁকড়ে ধ'রে" তৎ-দৃষ্টিতে ভিন্ন সম্ভাব্য যাবৎ মত বিচার করেন। যিনি নিজ মতে committed, দেখা যায় তিনি প্রায়শঃই এই দ্বিতীয় পন্থাবলম্বী। কিন্তু প্রথম পন্থাবলম্বীকে-ও যে commitment বিসর্জন দিতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। Commitment-এর সঙ্গে non-commital বিচারের কোন বিরোধ নেই। Commitment তার নিজ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে, non-commital বিচার-ও সম্ভাব্যতার গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

এমন অঘটন ঘটা-ও অসম্ভব নয় যে, স্বমত ও পরমতের non-commital বিচারের সম্ভাব্যতার গণ্ডির মধ্যেই স্বমতের এমন এক বা একাধিক মহা-দোষ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে যে, তার ধাক্কা এসে লাগে commitment-গণ্ডির গায়ে। ফল এমন হতে পারে যে, শিকড়শুদ্ধ ঐ committed মতটি ন'ড়ে উঠে, এবং তার ফল এমন হতে পারে যে, ঐ প্রচণ্ড ধাক্কায় মতটির প্রতি আমার commitment শিথিল থেকে শিথিলতর হতে হতে একেবারে শূন্য-পর্যায়ে নেমে আসে, এবং হঠাৎ আমি আবিষ্কার করি যে, আমি দ্বিতীয় সম্ভাব্য মতটি 'সত্য সত্যই গ্রহণ' ক'রে ফেলেছি। এরই নাম আস্থান্তর (conversion), ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মান্তর। সম্ভাব্য জগতে যে non-commital বিচার চলছিল সেটা কিন্তু এই আস্থান্তরের সরাসরি কারণ নয়। Non-commital বিচারের প্রতিক্ষেপেই আমার মতবাদের যে-যে পরিমাণ দোষ ধরা পড়ছিল ঠিক সেই সেই পরিমাণে আমি আস্থা হারাচ্ছিলাম, এবং ঠিক যতটা পরিমাণে প্রতিপক্ষীয় সম্ভাব্য মতের গুণ আবিষ্কৃত হচ্ছিল ততটা পরিমাণেই তার প্রতি আস্থাবান হয়ে উঠছিলাম। এক দিকে এই ক্রমবর্ধমান আস্থা ও অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান অনাস্থা-ই শেষ আস্থান্তরের সরাসরি কারণ। যৌক্তিক বিচারের সঙ্গে আস্থার ঠিক ততটাই সম্বন্ধ, যতটা আছে বুদ্ধিরূপ স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাতন্ত্র্যস্বরূপের মধ্যে। বুদ্ধিরূপ স্বাতন্ত্র্যবোধ স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ দেখিয়ে দেয় মাত্র।

আস্থানির্ধারণে যৌক্তিক বিচারের ভূমিকা অতি সীমিত। যৌক্তিক বিচারে অনেক সময়েই আস্থার কোন কথাই থাকে না, যদিও কখন

কখন যৌক্তিক বিচার পশ্চাৎপটবর্তী আস্থার খেলা দেখিয়ে দেয়। দেখিয়ে দেয় কী ভাবে পশ্চাদ্বর্তী আস্থাই আড়াল থেকে যুক্তির সূত্রগুলি 'নাড়াচাড়া' করছে। বিভিন্ন মৌল মতবাদের প্রাণস্বরূপ এই আস্থা—বা দৃষ্টি-ও কি বুদ্ধি নির্ধার্য নয়। স্বতঃই তারা প্রত্যেকে মৌল, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অতএব গ্রহণ-'যোগ্য'।

তবে কেন তাদের একটিমাত্র আমি গ্রহণ করেছি এবং অপরে অন্য একটি মতবাদ গ্রহণ করেছে? এ-প্রশ্নের উত্তর নেই। আমি, তুমি প্রত্যেকেই এক একটি আস্থা নিয়ে জন্মেছি, বড় হয়েছি। সেই মতবাদ পেয়েছি আমাদের পিতৃপিতামহ, আমাদের সমাজ ও সম্প্রদায় থেকে; মতবাদ যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় নি। Non-commital বিচার-জগতে পারস্পরিক দোষগুণ উদ্ভাবনের ফলে একদা-স্বীকৃত আস্থার পরিবর্জন ও নতুন এক আস্থার গ্রহণ হতে পারে—কী করে হয় পূর্বেই দেখান হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে যৌক্তিক বিচারের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, আস্থা-নির্বাচনে যৌক্তিক বিচারের প্রকৃত কোন হাত নেই। আস্থা থাকল তো থাকল, পরিবর্তিত হল তো হল। কোন-একটি নির্দিষ্ট আস্থার স্বপক্ষে যত যুক্তিই উপস্থাপিত করা হোক না কেন, সেই আস্থার কোন ইতরবিশেষ নাও হতে পারে। এ-যেন যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রাত্যক্ষিক ভ্রম নিরাসের বৃথা প্রয়াস। হাজার যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও দূরস্থ চাঁদকে ছোটই দেখি। আবার এক গাছি দড়িকে যখন ভুল করে সাপ ব'লে দেখি তখন সেই ভুল দূর করতে হলে যুক্তিতর্কের অবতারণার চেয়ে অনেক কার্যকর হয় সোজাসুজি উপদেশ—"আরও ভাল ক'রে 'দেখ'।" অর্থাৎ নতুন দেখাতেই সর্পভ্রমের নিরাস। তদ্রূপ, আমার যদি কোন মূল আস্থা থাকে যার উপর আমার সমস্ত জীবন নির্ভর ক'রে আছে, সেটা যদি ভুলও হয়ে থাকে তাহলেও কেবল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সে ভুল নিরাকৃত হতে পারে না।[১] অন্য এক আস্থার অপরোক্ষ অনুশীলনের ফলেই তা দূর হতে পারে। যে-আস্থা বা মতবাদ আমি মৌলিক ব'লে মনে করেছি, এই জাতীয় অনুশীলনের ফলে স্পষ্ট

১। কদাচিৎ যদি যুক্তিতর্কের শেষ ধাপে হঠাৎ আস্থান্তর ঘটে এবং যদি তৎপূর্বে নতুন মতের প্রতি আমার কোনও আস্থা ছিল না ব'লে বোধ হয়, সে-সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অচিন্ত্য প্রসাদ স্বীকার করতে হয়। তবে এ-জাতীয় ঘটনা অতি কদাচিৎ ঘটে।

দেখা যেতে পারে যে সেই আস্থাটি বা মতবাদটি মৌলিক নয়, সেটারও পিছনে প্রকৃত-মৌলিক অন্য একটি আস্থা বা মতবাদ রয়েছে। অথবা, সেই আস্থা বা মতবাদ নিজে মৌল হলেও 'আমার' জীবনের মৌল আস্থা বা মতবাদ নয়, বরং অন্য একজন তার জীবনের মৌল ভিত্তি ব'লে যে-আস্থা বা মতবাদের কথা বলেছে সেটাই আমার জীবনের প্রকৃত ভিত্তি। মৌলিক আস্থা বা মতবাদ সম্বন্ধে এ-জাতীয় ভুলের অবকাশ তো আছেই। কিন্তু এই ভুল দূর হয় আস্থাগুলির স্বরসসামর্থ্যেই, মূলতঃ যুক্তির প্রয়োগে নয়। যুক্তির প্রয়োগ এ-সব ক্ষেত্রে বড়জোর 'অবান্তর' সহায়ক-মাত্র, যেমন সর্পভ্রমনিরাস-মানসে যদি কেউ ভ্রান্ত পুরুষের কাছে যুক্তি দেখিয়ে বলে—দেখ, ওটা যদি সত্যই সাপ হত তাহলে এতক্ষণে ফণা তুলত, তেড়ে আসত, অথচ দেখ ও-সব কিছুই হচ্ছে না, অতএব ওটা নিশ্চয়ই সাপ নয়।' এ-সব যুক্তির ফল কেবল এইটুকু যে তাতে আমি বুঝি যে, জিনিষটা সাপ হওয়া 'উচিত নয়', অর্থাৎ ওর 'সম্ভাব্য' অ-সর্পত্ব—এমন কি সম্ভাব্য রজ্জুত্ব—সম্বন্ধে আমার যৌক্তিক প্রত্যয়-মাত্র জন্মায়। মৌল আস্থা বা মতবাদ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য।

অবশ্য, অ-সর্পত্ব বা রজ্জুত্বের এই জাতীয় সম্ভাব্যতা-মাত্রের অনুশীলনের ফলে অনেক সময় জিনিষটা সর্প নয়, রজ্জু—এটা স্পষ্ট 'দেখতে পাওয়া' যায়। কিন্তু এই 'দেখতে পাওয়া' ব্যাপারটা ঐ সম্ভাব্যতা-অনুশীলনের অবিনাভাবী নয়। যৌক্তিক বিচার সত্ত্বেও অনেক সময়ে 'এটা অমুক' বলে 'দেখা' ঘ'টে উঠে না, এবং যৌক্তিক বিচার না করা সত্ত্বেও অনেক সময়ে ওটা যে সাপ নয়, দড়ি—এ-ব্যাপারটা 'দেখতে' পাই। মৌলিক আস্থা বনাম যৌক্তিক বিচারের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা।

প্রকৃত মৌল মতবাদগুলির প্রত্যেকটিই সমভাবে মৌল, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমগ্র জীবনের মূল নিয়ন্ত্রক। তা যদি হয়, তাহলে তাদের 'যে-কোন একটা' গ্রহণ করলেই যথেষ্ট। 'যে-কোন একটা' গ্রহণযোগ্য—এ-কথা বললেই তো সব কটি মতের প্রতি সমান আদর দেখান হল। প্রকৃতই, 'সব কটি' মত এক সঙ্গে গ্রহণ করতে হয় না, পরপর-ও নয়, এমন কি যে-কোন দুটি, তিনটি বা চারটি এক সঙ্গে গ্রহণ করতে হয় না। যে-কোন একটা গ্রহণ করলেই সমগ্র জীবন সুন্দর ভাবে চলে। একাধিক মতবাদ গ্রহণের প্রয়োজনই যেহেতু নেই, অতএব জীবন উন্মথিত হবার

আশঙ্কা-ও নেই। আবার, একাধিক মত একসঙ্গে গ্রহণ করছি না ব'লে মতগুলি উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে সাজাবার প্রয়োজন-ও থাকে না।

(খ) তৃতীয় সমস্যার সমাধান

তৃতীয় সমস্যার সমাধান ঃ তৃতীয় সমস্যাটি বেশ জটিল। বাস্তবিক-ই তো অধ্যাত্মবাদ (অতিপ্রাকৃতস্বাতন্ত্র্য-বাদ) জড়বাদের (প্রাকৃতস্বাতন্ত্র্য-বাদের) অপেক্ষায় অধিকতর অগ্রসর। অধ্যাত্মবাদী তো প্রাকৃত মানুষের স্বাতন্ত্র্যব্যবহার অস্বীকার করেন না। তিনি কেবল ঐ স্বাতন্ত্র্যব্যবহারের মূল অন্বেষণ করেন এবং বলেন, মূলে আছে অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য। এই অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান পাবার পরে তিনি বলেন যে, অতএব যে-জিনিষটা প্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য ব'লে মনে হয়েছিল সেটা অবভাস-মাত্র, আসলে সেটা অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য। তাহলেই তো দেখা যাচ্ছে, অতি-প্রাকৃতস্বাতন্ত্র্য-বাদীরা জড়বাদীদের পিছনে ফে'লে কিছুটা বেশি অগ্রসর হয়েছেন। একই কথা নব্য জড়বাদ বনাম প্রাচীন জড়বাদের ক্ষেত্রে-ও প্রযোজ্য। প্রাচীন জড়বাদে স্বাতন্ত্র্য মাত্রেই—তা সে প্রাকৃতই হোক অথবা অতিপ্রাকৃত হোক—মিথ্যা অবভাস। প্রাচীন জড়বাদীর মতে এই মিথ্যাটা কিছুটা কাজে লাগান যায়, ঠিকই—যেমন মিথ্যা বিপদের অজুহাতে শত্রুকে ভয় পাইয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা মিথ্যা, অনির্বাচ্য ছায়ার মতো এটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে, এইমাত্র। অথচ, নব্য জড়বাদী বলেন, এটা নিয়মনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি-রাজ্যেরই এক সত্য—আত্মবিরোধী, অথচ প্রভূত উন্নতিবিধায়ক, প্রক্রিয়া। এদিক দিয়ে তো নব্যেরা প্রাচীনদের তুলনায় এগিয়ে গেছেন।

কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। তবুও বলব কোনও মতটাই অপরের চেয়ে হীন নয়। প্রথম অভিনবত্ব হল, অগ্রবর্তীই হোক অথবা পশ্চাতে পড়েই থাকুক, প্রত্যেক মতটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্ব স্ব পরিধির মধ্যে সুসমঞ্জস। পরিধিগুলিও কোনটি অপরের চেয়ে কম বিস্তারী নয়। প্রতিটি মত-ই সমগ্র জীবনের এক একটি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা ; প্রাকৃত জীবনের কোন দিকটাই এরা অব্যাখ্যাত রাখে না এবং এদের প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্যে কোন স্ববিরোধ-ও নেই। অথচ, যে-ভাবেই হোক, মনে তো হচ্ছে

একটি মত অন্য একটি মতের অপেক্ষায় অধিকতর অগ্রসর। ব্যাপারটা বিলক্ষণ জটিল-ই বটে। কিন্তু এরও ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাটি এই :

অমানিশার নির্মল আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজির মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রের প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে যদি বলি—অমুক বৃক্ষচূড়া এবং অমুক দেবালয়শীর্ষ যদি একটি সরলরেখা দ্বারা যুক্ত কর এবং সরলরেখাটি যদি ক্রমাগ্রসর হয়ে ·আকাশের অমুক বিন্দু স্পর্শ করেছে দেখতে পাও, তাহলে তার এত-হস্ত-পরিমিত দূরে উত্তর-পশ্চিমে যে অস্পষ্ট নক্ষত্রটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেইটি-ই নির্দিষ্ট নক্ষত্র : যদি এই ভাবে 'অরুন্ধতী'-ন্যায়ে নির্দেশ্য নক্ষত্রটি তার দৃষ্টিতে আনতে চাই এবং সত্যই যদি নক্ষত্রটি তখন তার দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলে বলতেই হবে পূর্বাবস্থার অপেক্ষায় সে অগ্রসর হয়েছে। উত্তম কথা। কিন্তু তথাপি যদি নক্ষত্রটি তার দৃষ্টিপথে না পড়ে তখন সে কী বলবে? সে বলবে —তুমি নক্ষত্রটি মনের সুখে দেখ, আমার কাছে ওটা থাকা বা না থাকা সমান কথা, আমি আমার জগৎ নিয়ে বেশ আছি। আমার কাছে আমার-দেখা জগৎ পরিপূর্ণ, বেশ সুসমঞ্জস। নক্ষত্র-প্রদর্শক অবশ্য বলতে থাকবেন—ও পিছনে পড়ে রইল. আমি এগিয়ে গেলাম। অন্য এক ব্যক্তি যদি ঐ পদ্ধতিতে নক্ষত্রটি দেখতে পায়, সে-ও ঐ কথাই বলবে। কিন্তু তাতে প্রথম ব্যক্তির কিছু আসে যায় না, সে বলতে থাকবে— তোমরা একটা মিথ্যা অজানা জিনিষ নিয়ে বাড়াবাড়ি করছ। যদি সে নিজে নক্ষত্রটি দেখতে পেত তাহলে সে-ও বলত—হ্যাঁ, আমি নতুন একটা জিনিষ পেলাম। কিন্তু সে তো দেখতে পায় নি, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও দেখতে পায় নি। সেইজন্যই সে বলে—তোমার নিয়ে তুমি খুসি থাক, আমাকে আর বোঝাতে এস-না, আমার নিয়ে আমি খুসি থাকব, তোমাকে বোঝাতে যাব না। আবার সেই মার্কিন-সোভিয়েত আঁতাত, আবার সেই সহাবস্থান। সহাবস্থান এখানে প্রথম প্রথম বিশেষ প্রীতিপূর্ণ হয় না, একথা সত্য। কিন্তু অভ্যাসের ফলে কালক্রমে প্রীতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়—অন্ততঃ সেটাই সকলে চায়।

দর্শনরাজ্যে-ও একই কথা। জড়বাদী অথবা প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী (empiricist) যদি শত চেষ্টা সত্ত্বেও অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধরতে না পারেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে অধ্যাত্মবাদীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই

বাঞ্ছনীয় ঃ এ-কথা বলা কখনই সঙ্গত হবে না যে, তাঁরা নিম্নস্তরের দার্শনিক। তাঁদের-ও উচিত হবে না এক কথায় অধ্যাত্মবাদ নস্যাৎ ক'রে দেওয়া। অধ্যাত্মবাদীর অনেক কথা তাঁরা প্রাকৃত ভাষায় বুঝবেন, কিছু কথার বেলায় 'আমাদের জানা নেই, জানবার ইচ্ছাও নেই, কারণ আমাদের ভাষায় তা বোঝা-ই যায় না' ব'লে চুপ ক'রে থাকবেন। তাঁরা যে তা করেন না, সেটা তাঁদের মূঢ়তা। অধ্যাত্ম-বাদীরাও ঐ একই মূঢ়তা বশে এঁদের হেয় প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হন। উভয় পক্ষেরই কর্তব্য হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

প্রশ্ন উঠতে পারে—আমি দেখতে পেয়েছি, অথচ তুমি চেষ্টা করেও দেখতে পেলে না, অতএব আমার কৃতিত্ব কি বেশী নয়? উত্তর—বেশি কৃতিত্ব স্বীকার করতাম যদি 'দেখা না-দেখা' ব্যাপারটা আমার তোমার উপর নির্ভর করত। কিন্তু—নক্ষত্রের বেলায় কী হয় জানি না—অধ্যাত্ম সত্যের বেলায় সমস্ত ব্যাপারটাই আকস্মিক। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধ্যাত্ম সত্য প্রত্যক্ষ করা যায় না, অতএব যদি আমার নিজ কৃতিত্বের কিছু অবকাশ থাকত তা হত যুক্তি-প্রয়োগে। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়েছি যুক্তি-প্রয়োগে অধ্যাত্মতত্ত্ব ধরা পড়ে না। তাহলে আর আমার করণীয় কী থাকে? নক্ষত্র-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে-ও হয়তো ঐ একই কথা বলা যায়। প্রাকৃত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই বা আমার করণীয় কতটুকু? আমি নির্দেশ্য বস্তুটির দিকে ঘাড় ফেরাই, ইন্দ্রিয়গত দোষত্রুটি দূর করতে সচেষ্ট হই, অন্তবর্তী বাধা অপসারণ করি, নির্দেশ্য বস্তুটির প্রতি যথাসাধ্য মনঃসংযোগ করি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে দেখতে পাব, এমন নিয়ম কি আছে? একটা জঙ্গলের ছবির পত্র-শাখার অন্তরালে পাখির মত দেখতে যে-সব ফাঁক থাকে সেই ফাঁকগুলি 'পাখির আকার' বলে প্রথমটায় অনেক সময় তো ধরা পড়েই না. বেশ কিছুক্ষণ মনযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের অনেকগুলি ঐ মূর্তিতে ধরা পড়ে না। অথচ সেদিকে ঘাড় ফিরিয়েছিলাম, ইন্দ্রিয়-ও নির্দোষ ছিল. মাঝে বাধা ছিল না এবং মনোযোগ-ও দিচ্ছিলাম। তবু তো দেখতে পেলাম না। পুরো মনোযোগ দিই নি, এ-কথা বলে কোনও লাভ হবে না। খানিকটা মনোযোগ তো দিয়েছিলাম। এক একটা জিনিষ দেখার জন্য কতটা ক'রে মনোযোগ প্রয়োজন, তার হিসাব কি কেউ জানে? এই-তো এতক্ষণ

ব. বি. / অনেকান্ত / ৪০-৯

পর্যন্ত মনোযোগ দিচ্ছিলাম, দেখতে তো পাই নি ; অথচ তার অব্যবহিত পরেই কেন দেখতে পেলাম, এ-রহস্য কে ভেদ করবে ? মনোবিজ্ঞানীরা-ও এই জাতীয় মনোযোগ-গণিত রচনা করতে পারেন নি। কী করে পারবেন, তাও জানি না। অতএব, আমি দেখতে পেয়েছি, তুমি চেষ্টা করেও পারলে না, সুতরাং আমার কৃতিত্ব বেশি এবং আমার জ্ঞানই যথার্থ—এ-কথা বলার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। সে-ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছাড়া গতি কী ?

অনুরূপ কারণে নব্য জড়বাদী-ও বলতে পারবেন না যে, তিনি প্রাচীন জড়বাদীর তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী, অধিকতর সত্যদ্রষ্টা। প্রাচীনপন্থী নব্যকে বলবেন—আমি শত চেষ্টা ক'রেও তোমার dialectic ধরতে পারলাম না, সেইজন্য আমি স্বাতন্ত্র্য বস্তুটিকে প্রাকৃত সত্য বলতেও নারাজ ; ওটা আমি জীবনে ব্যবহার করি, সত্য, কিন্তু তার অর্থ ঠিক কী তা তো আগেই বলেছি। নব্যের-ও উচিত প্রাচীনকে বলা—হ্যাঁ, তুমি যা বলছ সে-কথা আমি উড়িয়ে দিতে পারছি না, কিন্তু আমি প্রাকৃত জগতে স্পষ্টতঃ এই দ্বান্দ্বিক্ গতি সর্বদাই দেখি, এবং সেইজন্যই সেই 'ন্যায়ে' জগতের নির্বচন দিই। দ্বান্দ্বিক গতি, স্বাতন্ত্র্যের মিথ্যাত্ব, স্বাতন্ত্র্যের অতিপ্রাকৃতত্ব—এ-জাতীয় কোন কথাই কেবল যুক্তি-তর্ক সাহায্যে সত্য ব'লে প্রমাণিত হতে পারে না। কেবল-যুক্তি কোন নতুন সত্য দেয় না, পাওয়া-জিনিষকে অন্যান্য সম্ভাব্য সব জিনিষের সঙ্গে একই কাঠামোভুক্ত করাই তার কাজ—এ-কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এ-ক্ষেত্রে-ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

অতি-আধুনিক empiricists ও linguistic analyst-দের কথা আর পৃথক ভাবে আলোচনার প্রয়োজন নেই, কারণ, প্রথমতঃ তাঁরা অনেকাংশে এই নব্য বা প্রাচীন জড়বাদীদের সহধর্মী, এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁদের ক্ষেত্রেও অন্যান্য মৌল দার্শনিকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঐ একই যুক্তি-বলে সিদ্ধ হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত সেই সব মতবাদীদের কথা বলা হল যাঁদের মধ্যে একদল বলতে পারেন যে, তাঁরা অন্য সকলের চেয়ে এগিয়ে আছেন। কিন্তু এমন কয়েকটি মৌলিক মতবাদ-ও আছে যাদের কোনটিই অপরের অপেক্ষা অধিক অগ্রসরতা দাবি করতে পারে না। যেমন, (১) সেই

অধ্যাত্মবাদ যে-মতে অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য হল একটা 'তত্ত্ব', একটা দাঁড়া অতিপ্রাকৃত সত্য), অথবা একাধিক এই জাতীয় তত্ত্বাত্মক এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ যা প্রকৃতি-রাজ্যের অতীত, এবং (২) সেই অধ্যাত্মবাদ যে-মতে অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য, অতিপ্রাকৃত হয়েও, শুধু ব্যবহারাত্মক (*functional* as distinct from *substantive*)। এই দুই মতবাদের মধ্যে তেমন কোন পারস্পরিক বিরোধ নেই, উভয়ই সম পরিমাণে অতিপ্রাকৃত। সেইজন্য এদের কোনটিই অপরের তুলনায় অধিকতর অগ্রগামিত্ব দাবি করতে পারে না। বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে কোন্‌টি বেশি সত্য, বলা যায় না। এদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থিতি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

গোলমাল বাধে তখনই যখন এদের যে-কোন একটির বিরুদ্ধে অন্য একজনের অধ্যাত্মবাদ 'পূর্ণতা'র দাবি জানিয়ে বসে। যে-অধ্যাত্মবাদীরা পূর্ণতার দাবি জানান তাঁরা বলেন, অতিপ্রাকৃত জগতে ঊর্ধ্বচারণের ফলে একের পর এক 'তত্ত্ব' আবিষ্কার করতে করতে শেষ পর্যন্ত সত্যের চরম স্বরূপ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যাবতীয় দোষগুণ সমেত 'ফেলে আসা' প্রাকৃত জগৎ এবং 'ফেলে আসা' তত্ত্বসমূহের সুনির্বাচ্য স্থান নির্দেশ হয় না, এবং এই কারণেই এই সব অধ্যাত্ম-মত এক-পেশে, অর্থাৎ অপূর্ণ থেকে যায়। পূর্ণতা লাভের জন্য সত্যস্বরূপের সঙ্গে এদের সুসমঞ্জস সম্পর্ক অনুধাবন ক'রে এক মহা-সত্যে উপনীত হতে হবে, এবং সমগ্র অধ্যাত্ম ও প্রাকৃত জীবন সেই পথে গ'ড়ে নিতে হবে। আপাতদৃষ্টে মনে হয় এই পূর্ণতাবাদ অপর দুই অধ্যাত্মবাদের বিরোধী।

কিন্তু এখানে-ও প্রকৃত বিরোধ নেই। এঁরা অতিরিক্ত কোন নতুন সত্য দাবি করছেন না। অন্যান্য অধ্যাত্মবাদীদের মতে তাঁদের আবিষ্কৃত চরম স্বাতন্ত্র্য যেমন সত্যস্বরূপ এবং অন্যান্য তত্ত্ব ও প্রাকৃত জগৎ যেমন ঐ স্বরূপ কর্তৃক সৃষ্ট, এঁরাও ঠিক সেই কথাই বলেছেন। প্রভেদ এই যে, অন্যেরা কেবল 'স্বরূপ কর্তৃক সৃষ্ট', এইটুকু বলেই ছেড়ে দেন, সমস্তটা জড়িয়ে কী আকার নিল এবং জীবনটাকে কী পদ্ধতিতে তদনুযায়ী গ'ড়ে নিতে হবে, সে-সব ব্যাপারে এতটুকুও মাথা ঘামান না; কিন্তু এঁরা সে-সব কথাও আলোচনা করেন। এঁরা স্বীকার করেন যে, সত্যানুসন্ধান ও শান্তিলাভের পথে সত্য-স্বরূপ আবিষ্কার করাই চরম লক্ষ্য এবং ঐ সত্যস্বরূপ লাভ 'খাঁটি' জীবন-ও বটে। সে-দিক দিয়ে

এঁরা বাড়তি কিছু বলেন নি। এঁদের আসল বাড়তি বক্তব্য হল—সত্যের স্বরূপ ও 'খাঁটি' জীবন লাভ ক'রেও অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আরও কিছু চাওয়া যায়, এবং সেই আরও কিছু-টা পেলেই 'পূর্ণতা' লাভ হয়। এ-টুকু 'বাড়তি' কথা এইজন্য যে, সত্যানুসন্ধানের পথে 'পূর্ণতা' লাভ করতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

পরের পরিচ্ছেদে এই পূর্ণতাবাদের কথা আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে।

(গ) চতুর্থ সমস্যার সমাধান

পূর্বালোচিত মতগুলি প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুসমঞ্জস ও সমভাবে গ্রহণযোগ্য—এর অর্থ এই নয় যে সব কটি আমি এক সঙ্গে সত্য সত্যই গ্রহণ করব, অর্থাৎ 'স্বীকৃতগ্রহণ' করব। অর্থ এমনও নয় যে, অবস্থা-বিশেষে একটি, অবস্থান্তরে অন্য একটি, তৃতীয় এক অবস্থায় তৃতীয় একটি—এই ভাবে সব কটিই আমি একের পরে এক 'স্বীকৃতগ্রহণ' করতে পারি। দ্বিতীয় অর্থটি এই কারণে অসঙ্গত যে, তাহলে এদের কোনটিই জগতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয় না। অর্থ একমাত্র এই যে, এদের 'যে-কোন একটি গ্রহণ করতে 'পারি', কারণ প্রত্যেকটি সমভাবে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, মতগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক হল তাদের 'বৈকল্পিকতা'—এই মত 'অথবা' ঐ মত 'অথবা' তৃতীয় ঐ মত 'অথবা', ইত্যাদি—সমাহার নয়, অর্থাৎ এই মত 'এবং' ঐ মত 'এবং' ঐ মত 'এবং'……… ইত্যাদি নয়। এই হল অস্বীকৃতগ্রহণ রূপ অনেকান্ত।

সচরাচর 'ক অথবা খ' বললে বোঝায় যে, (১) ক এবং খ-এর মধ্যে একটিই সত্য, অন্যটি নয়, এবং (২) আমি জানি না কোন্‌টি সত্য। কখন কখন বা বোঝায় (১) এমন একটি স্বরূপ যা ক ও খ উভয়সাধারণ, কিন্তু (২) যেটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না এবং (৩) যেটা একবার ক-আকারে, অন্যবার খ-আকারে প্রতীয়মাণ হচ্ছে। উভয় প্রকারেরই সাধারণ বক্তব্য হল—সত্য একটা আছে, কিন্তু আমি সেটা জানতে পারছি না। অনেক সময়ে তার খানিকটা আঁচ পাই, যার ফলে বলি—জিনিষটা ক অথবা খ এবং 'অন্য কিছু নয়'। কোনও সময়ে বা কোন আঁচ-ই পাই না; ফলে অন্য এক বা একাধিক

বিকল্প যে থাকতে পারে সে-কথা নস্যাৎ করতে পারি না। কিন্তু কিছু পরিমাণে নির্ধারিত হোক বা না হোক, সচরাচর আমাদের এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, একটা কিছু সত্য স্বমহিমায় ওখানে বিরাজ-মান এবং বিকল্প দুটির উভয়েই সত্য হতে পারে না—তারা সমাহৃত হয়েই হোক অথবা বিকল্পাকারেই হোক। সচরাচর এই বিশ্বাস থাকে, এ-কথা ঠিক ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই বিশ্বাস অমোঘ, অনড় এবং কোন ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। যখনই আমরা কিছু বিশ্বাস করি তখন এ-কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে থাকে যে, বিশ্বাসটি সত্য বিশ্বাস বলে ধ'রে থাকব ততক্ষণই যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন কারণে সেটা বাধিত হচ্ছে, নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। এই নস্যাৎ-করণ তিন ভাবে হতে পারে। (১) অন্য একটা বিশ্বাস হঠাৎ প্রথম বিশ্বাসটির স্থান অধিকার ক'রে নিতে পারে, (২) প্রথম বিশ্বাসটির কিছু দোষ ধরা পড়ে, অথবা (৩) শত চেষ্টা সত্ত্বেও তথাকথিত 'স্বমহিমায় বিরাজমান' সত্যটির কোন আঁচই পাই না। আমাদের আলোচ্য মৌলিক মত-বাদগুলির বৈকল্পিকতা ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাধক বর্তমান। যা-কিছু অমৌলিক তার পিছনে মৌলিক একটা কিছু আছে এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই—এ-কথা প্রায় পুনরুক্তির সামিল। কিন্তু, 'মৌলিকে'র পিছনে আর-একটা মৌলিক আছে—এ-কথার কোন অর্থ নেই। যা 'আপাত' মৌলিক তদুত্তর কিছু প্রকৃত মৌলিক থাকতে পারে, কিন্তু 'আপাত' মৌলিক মানেই যা খাঁটি মৌলিক নয়। আমাদের আলোচ্য মতবাদগুলির মৌলিকতা কিন্তু খাঁটি ; এদের-ও অতীত আবার কী মৌলিক সত্য থাকতে পারে? ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, একাধিক বিকল্পের পিছনে নির্দেশিতব্য 'একটা' কিছু সত্য আছে বলে আমাদের যে-বিশ্বাস তা কেবল অমৌলিকের ক্ষেত্রেই সঙ্গত। মৌলিক বিকল্পের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের সম্প্রসারণ অসঙ্গত, উপাধি-দোষ-দুষ্ট। উপাধিটি হল 'অমৌলিক ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতা'।

মৌলিক মতবাদগুলির পারস্পরিক বৈকল্প্যে তৃতীয় বাধকের-ও সমান অবকাশ। শত চেষ্টা সত্ত্বেও কি মৌলিক মতবাদগুলির পিছনে কোনও এক-সত্য খুঁজে পাব? এরা মৌলিক, কারণ এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সত্যের যে-বিবরণ দেয় তার প্রত্যেকটি সত্যই মৌলিক।

এদের-ও অতীত আবার কী মৌলিকতর সত্য থাকতে পারে ?

প্রতিপক্ষী অবশ্য আপত্তি জানিয়ে বলতে পারেন—চরম মৌলিক সত্য একটাই এবং বিভিন্ন মতবাদগুলি সেই একমাত্র সত্যের বৈকল্পিক 'বিবরণ' ; বৈকল্প্য কেবল মতবাদগুলির, চরম সত্যের নয়। কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু অর্থহীন। কিছু একটা আছে কিন্তু তার কিছুই জানি না—এ-কথার অর্থ কী ? কিছুই যখন জানি না তখন 'সেটা আছে' বলবারই বা কী প্রয়োজন, কী সার্থক উদ্দেশ্য ? অপরে একটা জিনিষ মানে কিন্তু আমি তার কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না—এ-কথার অর্থ আছে, যদিও সে-অর্থ অতি দুরস্থ। অর্থ হল—তুমি ওটা মানতে থাক, আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু আমার কাছে ওটা কিছুই নয়। 'ওটা' শব্দের অর্থ এখানে হল 'যেটা তুমি মান' (তার চেয়ে বেশি কিছু নয়), যেখানে 'তুমি মান' ব্যাপারটা তথাকথিত 'জিনিষ'টার অবিচ্ছেদ্য বিশেষ। কিন্তু, আমি বা অন্য কারো দ্বারা জানা ব্যাপারটা যেখানে তথাকথিত জিনিষটার অবিচ্ছেদ্য বিশেষণ, সেখানে "জিনিষটা আছে"—একথা বলা যায় না। বলতে হয়, 'তোমার-জানা-জিনিষটা, অথবা আমার-জানা-জিনিষটা, আছে ; অর্থাৎ তুমি মনে কর ওটা আছে, অথবা আমি মনে করি ওটা আছে। সহজ কথায় 'জিনিষটার' পরিবর্তে বলতে হয় 'কল্পিত-জিনিষটা', 'সম্ভাব্য-মাত্র জিনিষটা'। কিন্তু তার অর্থ হল জিনিষটা কল্পিত বা সম্ভাব্য-মাত্র, অর্থাৎ জিনিষটা প্রকৃতপক্ষে 'নেই'।

পুনরায় আপত্তি হতে পারে—কিন্তু মানুষের জীবনের তো একটা চরম উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্যটারই বিভিন্ন বিবরণ কি এই মতবাদগুলিতে দেওয়া হচ্ছে না ? আমাদের উত্তর এই—প্রতি মানুষেরই জীবনের চরম উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু সব মানুষের উদ্দেশ্য এক নয়, যদিও প্রতি মানুষের কাছে, বা প্রতি মৌলিক দলের কাছে, তার উদ্দেশ্যই চরম। চরমত্ব আর সংখ্যাগত একত্ব এক জিনিষ নয়।

আবার, আপত্তি হতে পারে—কোন কোন দার্শনিক কি বলেন নি যে, চরম সত্য এক ও স্বরূপতঃ অনির্দেশ্য (অবাঙ্মনসোগোচর), এবং বিভিন্ন মৌলিক দর্শন ঐ 'এক ও অনির্বাচ্য' সত্যের প্রতীকী (নামরূপাত্মক) বিবরণ-মাত্র ? বিবরণ বিবরণই, চরম সত্য সে ঠিক ঠিক উপস্থাপিত করে না, প্রতীক হিসাবে তার দিকে 'যত দূর সম্ভব অভ্রান্ত' অঙ্গুলি-

নির্দেশ করে মাত্র। আমাদের উত্তর এই যে, অবশ্যই একদল প্রতিপক্ষী এ-জাতীয় কথা বলতে পারেন। কিন্তু এতে কোন্ ইষ্টসিদ্ধি হবে। এই মতবাদে কি যাবৎ মতবাদের বৈকল্প্য নিরাস হবে? এইটুকু মাত্র প্রতিপন্ন হয় যে, চরম সত্যের অবাঙ্গমনসোগোচরত্ব-ও অনেকগুলির মধ্যে একটি মতবাদ। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই মতবাদ সম্বন্ধে কিছু বলি নি এই কারণে যে, এ-বিষয়ে কোন 'আলোচনা' সম্ভবপর হয় না।

পুনরায় আপত্তি হতে পারে—চরম বৈকল্প্যবাদীর মতে যদি যাবৎ বৈকল্প্যোত্তর এক-সত্যের কোন আঁচই না পাওয়া যায়, তাহলে কোন্ যুক্তি-বলে কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট বিকল্প তাঁদের মতে মৌলিক হয়? ক এবং খ—এই দুই বিকল্পের অতীত স্বমহিমায় বিরাজমান কোন এক সত্যের কিছুটা আঁচ পেলে তবেই তো বলা যায় যে, প্রকৃত তত্ত্ব এখানে ক কিংবা খ 'এবং অন্য কিছু নয়'। কিছু আঁচ না পেলে তো অন্য বিকল্পের সম্ভাবনা রুদ্ধ হয় না। অতএব, কিছুমাত্র আঁচ না-পেয়েও এই বৈকল্প্যবাদীরা কী ক'রে বললেন—এই কটিই হল বৈকল্পিক মতবাদ, অন্য কোন বৈকল্পিক মতবাদ নেই?

এ-ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম উত্তর হবে, আমরা (হয়তো) অনিয়ত-বিকল্পবাদী। আমরা বলছি না যে, এই কটিই মৌলিক মতবাদ। যথা, আমরা তো প্রথম দিকে 'অনির্দেশ্য এক চরম সত্য আছে'—এই মত-বাদের উল্লেখ করি নি। কিন্তু প্রতিপক্ষীর আপত্তি প্রসঙ্গে এরও সম্ভাবনা পরে মানলাম। তদ্রূপ, অন্য কোন মতবাদের প্রসঙ্গ এলে তখন বিচার করে দেখব সেটা মৌলিক কিনা, এবং দেখাব যে, হয় সেটা আমাদের উপন্যস্ত কোন একটি মতের নামান্তর, না-হয় সেটা আর একটা বৈকল্পিক মতবাদ। যাই হোক, ঐ জাতীয় বাড়তি মতবাদের প্রসঙ্গ তো আসুক, তখন দেখা যাবে কী ভাবে আমরা সেটা গ্রহণ করব।

দ্বিতীয় এক উত্তর-ও আছে, এবং সেটা গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ। লৌকিক বিভজনের ক্ষেত্রে কার বিভজন করছি কিছুমাত্র না-জানা থাকলেও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে-জিনিষই বিভজ্যমান হোক তা হয় অমুক প্রকার, না-হয় তার বিপরীত প্রকার, হয় ক না-হয় অ-ক। ইংরাজিতে একে বলে formal consideration। এই কথাটা উত্থাপন

করা হল শুধু দেখাতে যে, বস্তুর বাস্তব ধর্ম জানা না থাকলেও তার সম্বন্ধে formally অনেক কিছু বলা যায়। আর একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া থাক। যখন আমরা বলি রং মূলতঃ সাত প্রকার তখন কি এই সাত প্রকার রং-এর অতীত রং-মাত্র বলে কিছু আছে মনে ক'রে তবেই এই কথা বলি ? বিভিন্ন রং-এর অতীত রং-স্বরূপ ব'লে কিছু একটা আছে, এ-কথা আমাদের মাথায় থাকে না। রং-স্বরূপ যদি বা কিছু থাকে, বিভিন্ন রং বাদ দিয়ে সে জিনিষটা কী হতে পারে তার কোন ধারণাই আমাদের নেই। রং মানেই বিভিন্ন-প্রকার বিশেষ বিশেষ রং, এদের অতিরিক্ত রং-স্বরূপ বলে কিছু নেই। অথচ, প্রিজ্‌ম্ মাধ্যমে রশ্মিভঙ্গজাত বর্ণালীতে 'যাবৎ' -প্রকার রং-এর জ্ঞান আমাদের হয়। ন্যায়-বৈশেষিকের বর্ণত্ব-'জাতি' এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ওদের 'জাতি' পদার্থটা একেবারে অমূর্ত, আর আমরা যাকে রং-স্বরূপ বলছি সেটা কিন্তু মূর্ত বলেই অভিপ্রেত।

তৃতীয় একটি বিভজন-দৃষ্টান্তে আমাদের বক্তব্য স্ফুটতর হবে। জগতের যা-কিছু পদার্থ তা হয় ভৌতিক, না-হয় জীবন্ত, না-হয় মানস, না-হয় অতিমানস, না-হয় অব্যবহিত যে-কোন দুটির যেন-অন্তরালবর্তী 'আধা-এই এবং আধা-ঐ'[১]—এই বিভজন নিঃসন্দেহে অভ্রান্ত, এবং 'সব কিছু' সম্ভাব্য বিভাগই এখানে ধরা হয়েছে। অথচ, এদের পশ্চাৎপটবর্তী কোন 'এক পদার্থে'র উল্লেখ করা প্রয়োজন হচ্ছে না। রং-এর ক্ষেত্রেও রং-স্বরূপ না মেনেও বিভিন্ন রং-এর কথা বলা যায়, কিন্তু সেখানে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না জগতে কেবল এই কটি রং-ই থাকতে পারি।[২] বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিশ্চয়-জ্ঞান রয়েছে, অথচ বিভিন্ন বিভাগের পশ্চাতে কোনও 'এক বস্তু' স্বীকার করতে হয় নি। যে-জাতীয় দৃষ্টিতে এই প্রকার নিশ্চিত বিভজন সম্ভব হয়, চরমসত্য-বাচক যাবৎ মতবাদ-ও সেই দৃষ্টিতে আমরা পাই। এটা কোনও প্রাকৃত দৃষ্টি নয়। প্রাকৃত দৃষ্টিতে পশ্চাৎপটীয় 'একের'র জ্ঞান বিনা-ই বিভিন্ন বিভাগ পাওয়া সম্ভব, কিন্তু বিভাগের পর্যাপ্তিতে নিশ্চিত জ্ঞান

১। এই বিভজনে, অবশ্য, প্রতি পরবর্তী বিভাগ তার পূর্ববর্তী বিভাগের লক্ষণধর্ম-সম্বলিত হয়েও বাড়তি কিছু।

২। এক ভাবে অবশ্য বলি যে, বর্ণালীতে আমরা সব রং-ই পেয়েছি। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব বিজাতীয় রং-এর সম্ভাবনা থেকে যায়। হিউম দ্রষ্টব্য।

হয় না, নতুন এক বিভাগ আবিষ্কারের সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে ; প্রাপ্ত বিভাগগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্জনের সম্ভাবনা-ও থেকে যায়। যে-দৃষ্টিতে সর্বগুণান্বিত বিভজন পাওয়া যায়—অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, প্রাপ্ত বিভাগগুলিই সব, এ-ছাড়া আর কোন-ও বিভাগ নেই, এবং এই জ্ঞানে কোনও 'একে'র জ্ঞান আপেক্ষিত হয় নি—সে-দৃষ্টি অতিপ্রাকৃত, আধ্যাত্মিক। সে-দৃষ্টি আসে মানুষের স্বাতন্ত্র্য-বোধ থেকে। 'এক সত্য'-অনপেক্ষ মৌলিক মতবাদগুলির পর্যাপ্তি ও নিশ্চিত বৈকল্প্য জানা যায় এই অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য-দৃষ্টিতে। এ-সব ক্ষেত্রে বিভাগগুলি প্রাকৃত অভিজ্ঞতা-লব্ধ নয়, এরা অতিপ্রাকৃত আত্মবোধেরই নামরূপাত্মক প্রকাশ।

অনেকে বলেন, অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টির সুন্দরতম, হয়তো বা একমাত্র, কাজ হল 'বহু-র মধ্যে এক' পাওয়া, বৈচিত্র্যকে এক মূল সূত্রে গ্রথিত করা। এ-কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু এর অর্থ লোকে যা বোঝে তা নয়। এর প্রকৃত অর্থ পরবর্তী পরিচ্ছেদে নির্ণয় করা হবে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা এর ঠিক বিপরীত কথা ব'লেই আপাততঃ ক্ষান্ত হচ্ছি। বলছি যে, স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টিতে 'নিছক' বহু-ও পাওয়া যায় ; বিশেষ এই যে, বহু এখানে সমাহৃত নয়, বৈকল্পিক। উভয় ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টিতে যে জ্ঞান লাভ হয় তা নিশ্চিত জ্ঞান। প্রাকৃত দৃষ্টিতে কখনই নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না।

'ক অথবা খ'—এই বাক্যাংশের আরও এক অর্থ আছে। সে-অর্থ হল, এদের মধ্যে যে-কোন একটাই যথেষ্ট, অন্যটির প্রয়োজন নেই, যদিও অন্যটি থাকলেও ক্ষতি নেই। ট্রেনে ভ্রমণকালে যাত্রীর কাছে 'প্রথম শ্রেণীর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর' টিকিট থাকতেই হবে। কিন্তু এর অর্থ কখনই এই নয় যে দুটো টিকিটই সঙ্গে রাখা তার পক্ষে অন্যায় হবে। অর্থ এই, যে-কোন একটি টিকিট থাকাই যথেষ্ট—অন্যটি থাকে থাক, কিন্তু প্রয়োজন নেই। এই হল 'ক অথবা খ'-এর ব্যাবহারিক অর্থ'। মৌলিক মতবাদগুলির বৈকল্প্য এভাবেও বোঝা যেতে পারে। সত্যান্বেষীর পক্ষে এদের যে-কোন একটাই যথেষ্ট। ব্যাবহারিক, অর্থাৎ প্রাকৃত, গ্রহণের দিক থেকে এদের যে-কোন একটাই যথেষ্ট, অন্য মতবাদগুলি, সম্ভব হলে, সে স্বীকৃত-গ্রহণ করতেও পারে, ক্ষতি নেই,

ব, বি, / অনেকান্ত / ৪০-১০

কিন্তু তার প্রয়োজন-ও নেই। প্রশ্ন হতে পারে—একাধিক মতবাদ তো গ্রহণ'যোগ্য', অর্থাৎ সম্ভাব্য-মাত্র, কিন্তু সত্যান্বেষীর পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী টিকিটের মতো একই সঙ্গে একাধিক মতবাদের প্রকৃত গ্রহণ সম্ভব হয় কী প্রকারে? এদের অন্ততঃ কয়েকটি তো পরস্পরবিরুদ্ধ। এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈদান্তিক অনেকান্তবাদ

মৌলিক মতবাদ নানা প্রকারের হতে পারে, আমরা পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি। প্রত্যেক মতবাদটিই মৌলিক এই জন্য যে, প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ পরিধির মধ্যে সুসমঞ্জস। প্রতিটি মতবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণ এই জন্য যে, প্রত্যেকটিতে জীবনের সমস্ত দিকের সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে বিধৃত। কোনও মতবাদে যদি সব দিকের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা না থাকে, অথবা ব্যাখ্যা যদি সুসমঞ্জস না হয়, তাহলে ঐ মতবাদ মৌলিক হতে পারে না। দর্শনের ইতিহাসে মৌলিক মতবাদ চিরকালই একাধিক, এবং এদের অন্ততঃ বেশ কয়েকটি অন্য কয়েকটির একান্ত বিপরীত, যার ফলে সব কটি একত্র একই সময়ে সত্য সত্যই গ্রহণ করা অসম্ভব মনে হয়। আমি 'এই মত'ও সত্য সত্য গ্রহণ, অর্থাৎ স্বীকৃতগ্রহণ, করছি এবং 'ঐ মত'ও স্বীকৃতগ্রহণ করছি, এ-কথা মনে হয় যেন কেউই বলতে পারবেন না। অবশ্য, এমন এক দল মৌলিক মতবাদীর উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি যাঁরা হলেন পূর্ণতাখ্যাতি-বাদী, যাঁদের কথা শুনলে মনে হয় তাঁরা যেন সব কটি মত—অন্ততঃ বেশ অনেকগুলি—কোন ভাবে একত্রিত করে স্বীকৃতগ্রহণ করেছেন। কিন্তু, প্রথমতঃ পূর্ণতাবাদী হলেও তাঁদের অনেকে এ-কথা অস্বীকার করেন না যে, যে-কোন একটি মত গ্রহণ করলেও চরম সত্য পাওয়া যায়—তাঁদের মতে পূর্ণতার সঙ্গে চরমত্বের কোন বিরোধ নেই। দ্বিতীয়তঃ, এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখাব যে, সচরাচর এই পূর্ণতাবাদকে যে-ভাবে চিত্রিত করা হয় সেটা ওর আসল চিত্র নয়।

চরম সত্য বহুমুখী—সহস্রশীর্ষ ও সহস্রপাদ। কিন্তু প্রতিটি মুখ, প্রতিটি শীর্ষ ও প্রতিটি পদ স্বগৌরবে গরীয়ান, কেউ অন্যের অপেক্ষা

রাখে না। প্রত্যেকেই "একাই একশ"। চরম সত্য সব কটি আকারের সমাহার নয়। এমন কথা নয় যে, একটি মুখ চরম সত্যের এক দিকের কথা বলে, ভিন্ন একটি মুখ ভিন্ন দিকের কথা বলে; একটি শীর্ষ চরম সত্যের এক দিকের মহিমাধর, অন্য শীর্ষ অন্য দিকের ; এবং একটি পদ সত্যের একটি ভিত্তির উপর ন্যস্ত, অন্য পদ অন্য ভিত্তির উপর। তাই যদি হত, তা হলে কোনটিকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যেত না। প্রতি দিকটাই পুরোপুরি সত্য, কোনটিই খণ্ডিত সত্য নয়; প্রতি পদ, প্রতি শীর্ষ, প্রতি মুখ-ই ভূমা ব্রহ্ম।

এই সহস্র-স্বরূপ সত্যের যে-কোন একটি স্বরূপ বেছে নিয়ে আমরা স্বীকৃতগ্রহণ করি। 'বাছা'-কাজটা সম্পন্ন হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের অজ্ঞাতসারে। পিতৃপিতামহদের চিন্তাধারা, সামাজিক পরিবেশ, সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি 'আধা-জানা আধা-অজানা' কারণে নিজেদেরও অলক্ষ্যে আমরা একটা সত্যস্বরূপ বেছে নিই। 'বাছা'-কাজটি আবার অনেক সময়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে বাদবিচারের মাধ্যমেও সহসা নিষ্পন্ন হয়। যে-ভাবেই হোক, বিভিন্ন পরিবেশে আমরা যে-কোন একটা নির্দিষ্ট সত্যস্বরূপ বেছে নিই, কিন্তু সব বাছাই করার মধ্যে একটা মারাত্মক দুর্বলতা থেকে যায়ঃ যাদের মধ্য থেকে বাছাই করেছি, অর্থাৎ যাদের স্বীকৃতগ্রহণ করি নি, তাদের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু ধারণা আমাদের থেকে যায়। অন্ততঃ এইটুকু ধারণা থেকে যায় যে, আমার স্বীকৃতগৃহীত সত্যস্বরূপের বাইরে আরও কিছু সত্যস্বরূপ আছে যা অপরে গ্রহণ করতে পারে। 'আছে' শব্দের অর্থ এখানে এই নয় যে সেগুলিও সত্য সত্য গ্রহণ করেছি, আমি committed হয়েছি। যে-অর্থে বলি 'সম্ভাবনা আছে' এখানে 'আছে' শব্দটি সেই অর্থে বুঝতে হবে। অন্য সব সত্যস্বরূপের 'সম্ভাবনা' এই ভাবেই আমার স্বীকৃতগৃহীত সত্যস্বরূপের চারি ধারে ছায়ার মতো ঘু'রে বেড়ায়। পথচলার সময়ে ছায়ার দিকে সচরাচর আমাদের নজর পড়ে না, পড়লেও সেটা আমরা অতি লঘু ভাবে নিই। কিন্তু এমন-ও তো অনেক সময়ে ঘটে যে, কোনও আকস্মিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ ছায়া হঠাৎ প্রবল ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বসে। তখন তো আমার এতাবৎ-কাল-জানা কায়া-জগতের বহির্বর্তী

অন্য এক অজ্ঞানা-পূর্ব কায়ার সন্ধান করতেই হয়।[১] আবার এমন লোকও থাকতে পারে যারা প্রথম থেকেই ছায়ার প্রতি-ও আকৃষ্ট। এদের কাছে ছায়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু নয়।

ছায়া ততক্ষণই অগ্রাহ্য করি যতক্ষণ আমরা দৈনন্দিন স্থূল প্রাকৃত জীবনের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু যাঁরা সত্যস্বরূপের সন্ধানী তাঁরা বাস করেন প্রাকৃত জীবনের এক অতি উচ্চতন স্তরে। যে-বুদ্ধির আলোকে কোন-এক সত্যস্বরূপ তাঁদের কাছে উদ্ভাসিত হয় সেই আলোক-ই ঐ সত্যের বিপরীতভাগবর্তী ছায়ার জগৎ-ও প্রকাশ করে। ছায়ার বোধ কেবল অভাব-মুখে হয় না, ছায়া 'না-দেখা শূন্যে'র মতো অনস্তিত্ব-মাত্র নয়, ভাব-মুখেই ছায়া দৃষ্টিগোচর হয়। উদ্ভাসিত সত্যস্বরূপের পশ্চাৎপটে তদ্ভিন্ন সমস্ত সত্যের পুঞ্জীভূত ছায়া নিত্য আবর্তিত হয়ে চলে। আমরা অনেক সময়ে তা দেখেও দেখি না। না-দেখলেও বেশ চ'লে যায়, কারণ ছায়া কখন-ও কায়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না, ছায়া বড় জোর ক্ষীণ প্রতিবাদ জানায়। আমাদের ক্ষেত্রে-ও ছায়া মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষান্ত—শুধু এইটুকু বলে, তুমি যেটা সত্যস্বরূপ ব'লে জেনেছ তা-ছাড়া আরও অনেক সত্যস্বরূপ আছে; তুমি সেগুলি গ্রহণ না-কর ক্ষতি নেই, কিন্তু তারাও যে সত্যস্বরূপ এ-কথা অস্বীকার করতে পারবে না।

আমার বাছাই-করা নির্দিষ্ট সত্যস্বরূপটি আমি স্বীকৃতগ্রহণ করলেও এই পিছটান থেকে যায়। পিছটান অগ্রাহ্য করলেও আমার কিছু ক্ষতি নেই, এ-কথা ঠিক। কিন্তু যদি সেটা গ্রাহ্য ক'রে তার সূত্র অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হয়ে বৈকল্পিক ভাবে সেই সত্যস্বরূপগুলিও গ্রহণ করি, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। অধিকন্তু লাভ এই যে, আরও সত্য পেলাম, যদিও বৈকল্পিক ভাবে। পুনশ্চ, আমার নির্দিষ্ট সত্যস্বরূপ পেয়েও যদি অন্য এক সত্যস্বরূপ পাই, তাহলে ঐ একই পদ্ধতিতে এই দ্বিতীয় সত্য থেকে তৃতীয় এক সত্য পেতে পারি—এই ভাবে সব কটি সত্যে ঘু'রে আসতে পারি। এমন-কি, নতুন-পাওয়া সত্যের কোন এক ছায়া-সূত্র ধ'রে

১। অদ্বৈত মতে সব ছায়াই এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ কায়ার নামরূপাত্মক অবভাস। কিন্তু ছায়া যদি মৌলিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে দেখা দেয় তাহলে প্রতিটি মৌলিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ছায়ার জন্য এক একটি মৌলিক স্বয়ংসম্পূর্ণ কায়া না-মেনে কি গত্যন্তর থাকে?

ইতিমধ্যে-পাওয়া কোন সত্যে নতুন ক'রে আবার ফিরে আসতে পারি।

এই যে এক সত্য থেকে 'বৈকল্প্য'-ন্যায়ে অন্য সত্যে অতিক্রমণ, এতে প্রত্যেক সত্যস্বরূপেরই স্বীকৃতগ্রহণ হয়। বিশেষ এই যে, এ-গ্রহণ সব কটি সত্যের একত্রীকৃত গ্রহণ নয়। এ একপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন দোলাচল খেলা (seesaw)। প্রথম পরিচ্ছেদে এরই নাম আমরা দিয়েছিলাম 'বিশ্বদোল'। বিশ্বভ্রমী সত্যান্বেষী পুরুষ এই দোলাচল-বৃত্তি অবলম্বন ক'রেই এক সত্য থেকে সত্যান্তরে নিরন্তর পরিভ্রমণ করেন। বিশ্বসত্য নিজেও এই দোলে নিত্য দোলায়মান।

সব সত্যান্বেষীকেই যে এই দোলে দুলতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা কিন্তু নেই। যাঁদের চিত্ত উপরিউক্ত ছায়াসূত্রে আকৃষ্ট হয়ে সত্য থেকে সত্যান্তরে যেতে চায়, কেবল তাঁদের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। ছায়াসূত্রের কোনও আকর্ষণ যাঁদের কাছে নেই তাঁরা একটি সত্যস্বরূপ লাভেই চরম সার্থকতা লাভ করেন। যাবতীয় অপর সতস্বরূপ তাঁদের কাছে তখন 'সম্ভাব্য' সত্য-মাত্র। সেগুলি তাঁদের কাছে কেবল গ্রহণ'যোগ্য'। বাস্তবে গৃহীত নয়। যোগ্যতা-মাত্র স্বীকারেও চিত্তের অপার ঔদার্য প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রকৃতগ্রহণে—স্বীকৃতগ্রহণে—এই ঔদার্য কর্মাভিমুখী স্থিতি লাভ করে।

(খ) বিভিন্ন মৌলিক মতবাদের অনেকান্ততা প্রদর্শন

এখন দেখা যাক যে-কটা মৌলিক মতবাদের উল্লেখ আমরা করেছি, বিভিন্ন ছায়াসূত্র ধ'রে তাদের একটা থেকে অন্য একটি সত্যে যাওয়া কী ক'রে সম্ভব হয়। প্রথমেই জড়বাদের কথা ধরা যাক্।

কোন জড়বাদীই অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য মানেন না। কিন্তু, 'মানেন না' শব্দের অর্থ কী? আধ্যাত্মিকতার একটা বোধ যে আছে, একথা তাঁরা অস্বীকার করেন না। তাঁরা শুধু বলেন এই বোধ মিথ্যা: তাঁদের মতে আধ্যাত্মিকতা আদৌ বস্তুসৎ নয়, 'আছে' ব'লে মনে হয় মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেই। একদল জড়বাদীর মতে ওটা ছায়া-মাত্র (epiphenomenon), অন্য দলের মতে ওটা আসলে প্রকৃতির-ই এক স্ববিরোধী খেলা। ছায়াবাদী ছায়াটা অগ্রাহ্য করতে চান, কিন্তু

তবুও একান্ত অভাব-মুখে 'ওটা কিছুই নয়', একথা বলতে পারেন না। তার অর্থ কি এই নয় যে, বড় বিরক্তিকর ঐ জিনিষটা কিছুতেই ফে'লে দেওয়া যাচ্ছে না? যদি তাই হয়, তাহলে দোষ কোথায় যদি কেউ ঐ ছায়ার প্রতি একটু সহানুভূতি দেখিয়ে সে কী চায় তা নিরূপণ করতে বসে? বিলাসী ধনীর সাড়ম্বর জীবনে অনাহারক্লিষ্ট ভিক্ষুকের ছবি হয়তো কোন রেখাপাত করে না। কিন্তু তাঁর তরুণ সন্তান যদি একটু ভেবে দেখতে চায় এরা কারা এবং কেনই বা এরা অনাহারক্লিষ্ট, তাহলে তাকে বাধা দেবার কিছু নেই। অথচ, একবার যে আন্তরিক ভাবে এই সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাকে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে হয়—সে আর-একটা পুরো জগৎ আবিষ্কার ক'রে ফেলে। তদ্রূপ, জড়বাদীদের মধ্যে যাঁরা স্বাতন্ত্র্যাকারী ছায়া অগ্রাহ্য না-ক'রে তন্মূলক কায়ার সন্ধানে একবার প্রবৃত্ত হন, তাঁদের অনেকখানি অগ্রসর হ'য়ে এক নতুন জগতে এসে পড়তে হয়।

তা-ছাড়া, এই প্রাচীন জড়বাদীরা কি ছায়াটা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন? তাঁরা তো নিজেদের সুবিধামত এর ব্যবহার করেন। তা না হলে তাঁরা এই প্রকৃতি-রাজ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন কী করে? স্বাতন্ত্র্যটিকে তাঁরা অবশ্য ছায়া ব'লেই মনে ক'রে থাকেন। কিন্তু ব্যবহার তো করেছেন, তা সে ছায়া ব'লেই হোক তার বাস্তব ব'লেই হোক।

যাই হোক, ছায়া-রূপ স্বাতন্ত্র্যের উৎস সন্ধানে কিছুটা অগ্রসর হয়েও 'নব্য' জড়বাদীরা বললেন, ঐ জিনিষটা প্রকৃতির বাইরে থেকে আসে না। স্বাতন্ত্র্য, তাঁদের মতে, প্রকৃতির-ই এক 'ডায়ালেকটিকাল' খেলা। এঁদের কাছে স্বাতন্ত্র্য আর ছায়া নয়, রীতিমত এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র যা দিয়ে মানব-প্রকৃতি এবং জড়-প্রকৃতি উভয়েরই নিষ্প্রাণ উদ্দামতা, উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচার, প্রকৃতির এক অংশ কর্তৃক অন্য অংশের অবদমন প্রভৃতি যাবতীয় অসামঞ্জস্য দূর ক'রে সমস্ত জিনিষটায় বিরাট সুসমঞ্জস আকার দিতে হবে। মানবেতর পশু ও জড় জগতে এই 'ডায়ালেকটিকাল' খেলার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নি; অসামঞ্জস্য দূর করার চেষ্টা বরাবরই চলেছিল, কিন্তু পূর্ণ বিকাশের অভাবে সে-চেষ্টা যতটা সফল হওয়া উচিত ছিল হয় নি। মানব-প্রকৃতিতেই এই 'ডায়ালেকটিক' সবচেয়ে

স্ফুট। তাই মানুষ-রাজ্যেই সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস এত আপ্রাণ। এ-প্রয়াস আজ-ও পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, এ-কথা সত্য। কিন্তু এটাও সমান সত্য যে পূর্ণ সাফল্যের দিকে এই প্রয়াস দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

অতএব, নব্য জড়বাদীর মতে স্বাতন্ত্র্য মানুষের এক রীতিমত কার্যকর ধর্ম, এবং স্বাতন্ত্র্যবান মানুষ, তার স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, প্রথম থেকে শেষ অবধি রীতিমত এক প্রাকৃতিক জীব; কোথাও কিছু অতিপ্রাকৃত অধ্যাত্ম নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—যদিও এই জড়বাদীরা প্রাচীন জড়বাদীদের অপেক্ষায় আপাতদৃষ্টে অধিক অগ্রসর তথাপি এঁরা কি অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিকতা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন? বারে বারে এঁরা বলেছেন—বাইরের অনেকেই স্বাতন্ত্র্যের আধ্যাত্মিকতা মানেন ও মেনেছেন। এ-কথাও তাঁরা স্বীকার করেন যে, তাঁদের নিজেদের সমাজেই এ-বিশ্বাস নানা ছিদ্রপথে, প্রায়শঃই নানা ছদ্মবেশে, এমন-কি সুযোগ পেলে খোলা-খুলি ভাবে, আত্মপ্রকাশ করে। সমস্ত ছিদ্রপথ রুদ্ধ করতে তাই এঁদের এত প্রাণান্তকর প্রয়াস। অতএব দেখা যাচ্ছে, অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্যের 'সম্ভাবনা'টি তাঁরা নস্যাৎ করতে পারলেন না। তাঁরাও স্বীকার করতে বাধ্য থাকছেন যে, অন্ততঃ ছায়ার আকারে এই স্বাতন্ত্র্যের অতিপ্রাকৃতত্ব এখনও তাঁদের চিত্তরাজ্য ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। প্রাচীন জড়বাদীদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এইটুকু যে, প্রাচীনেরা পুরো স্বাতন্ত্র্য আধ্যাত্মিকতাকে ছায়া বলেছেন আর এঁরা স্বাতন্ত্র্য পদার্থটিকে প্রাকৃত বস্তুসৎ ব'লে স্বীকার ক'রেও এর আধ্যাত্মিকতাকে অ-বস্তুসৎ, এবং কেবল বিরক্তিকর নয়, রীতিমত ক্ষতিকর ছায়া ব'লে মেনেছেন। এঁরা অবশ্য এমন এক আদর্শ মানবিক পরিবেশ কল্পনা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যেখানে এই প্রেতাত্মক ছায়ার কোনও লুকোচুরি খেলা থাকবে না। কিন্তু সেই পূর্ণাঙ্গ মানবচিত্র আজ-ও এঁরা এঁকে উঠতে পারেন নি। তাই এঁদের অনেকে কেবল কথা ব'লে হাল ছেড়ে দিয়েছেন যে, এই প্রেতাত্মার সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই ক'রে যেতে হবে; অর্থাৎ এর সমূলে বিনাশ হবে না।

এই অনিশ্চিত অবস্থায় এঁদেরই এক সন্ততি যদি নিছক ঔৎসুক্যভরে

সন্ধান নিতে চায় এই প্রেতাত্মা কী বার্তা নিয়ে আসছে, কোথায় তার ঘর, ইত্যাদি, তাহলে তার কাজে বাধা দেবার কি কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? বাধা এঁরা দেন, এবং সাংঘাতিক ভাবে; কিন্তু চিরকাল ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, এ-ভরসা কোথায়?

এই প্রেতলোকের পথ ধ'রে যাঁরা সাহসভরে এগিয়ে যান তাঁদের সামনে সহসা একটা অতিপ্রাকৃত জগতের দ্বার খুলে যায়। সে-জগৎ প্রেতলোকই হোক বা অন্য কিছু হোক, সেটা প্রকৃতি-রাজ্যের সীমানার ও-পারে, অতএব অতিপ্রাকৃত এবং আধ্যাত্মিক। এই অধ্যাত্ম-লোকের সঙ্গে প্রকৃতি-লোকের কী সম্বন্ধ, সে-বিচার পরে হবে। মোট কথা যাঁরাই স্বাতন্ত্র্যের এই অতিপ্রাকৃত রূপ দেখেন তাঁরাই অধ্যাত্মবাদী।

এই অধ্যাত্মবাদীদের একদল স্বাতন্ত্র্য ব্যাপারটিকে আধ্যাত্মিক বললেও তা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেন না। স্বরূপে এই স্বাতন্ত্র্য আধ্যাত্মিক হলেও তাঁদের মতে এটা কোনও মূর্ত বস্তু নয়, কোন তত্ত্ব নয়। আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য তাঁদের কাছে পুরোপুরি ব্যবহারাত্মক, নিছক ব্যবহার-প্রণালী, অন্য কিছু নয়। ব্যবহারের বিষয়বস্তু হল আমাদের অতি পরিচিত এই প্রাকৃত জগৎ। অ-স্বতন্ত্র অবস্থায় যখন আমরা একান্ত ভাবে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রাধীন, তখন আমাদের ব্যবহার নিরবশেষে যান্ত্রিক; প্রাকৃত জগৎ আমরা এক ভাবে ব্যবহার করে যাই, এইমাত্র। ব্যবহার করব না, অথবা অন্যভাবে ব্যবহার করব, এ-জাতীয় সিদ্ধান্তের অবকাশই তখন থাকে না। এই অবকাশ দান স্বাতন্ত্র্যের কাজ। স্বতন্ত্র মানুষ প্রকৃতিকেই 'নতুন ভাবে' ব্যবহার করে, নিছক প্রকৃতির নির্দেশে ব্যবহার করতে সে অস্বীকৃত হয়। এই যে নতুন ব্যবহার বা প্রকৃতি-নির্দেশের অ-ব্যবহার, উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু বিষয়বস্তু হল প্রকৃতি। স্বাতন্ত্র্য নিজে এই নতুন ব্যবহার বা অ-ব্যবহারের স্বরূপ-মাত্র। ব্যবহার-স্বরূপ (অতএব, অ-'ব্যবহার'-স্বরূপ) হল একজাতীয় সংস্কার (disposition) বা দৃষ্টি। ফলে দাঁড়াল এই যে, আধ্যাত্মিকতা একপ্রকার সংস্কার বা দৃষ্টি। অবশ্যই আমাদের এই সংস্কার বা দৃষ্টি লাভ করতে হবে এবং তার জন্য যা-কিছু সাধনের প্রয়োজন সবই করতে হবে। কিন্তু এই দৃষ্টি বা সংস্কার লাভের অর্থই হল ঐ দৃষ্টিতে, বা ঐ সংস্কারের মাধ্যমে, এই প্রাকৃত জগৎ নতুন ভাবে ব্যবহার করা—নতুন ভাবে জানা,

ব, বি, / অনেকান্ত / ৪০-১১

নতুন ভাবে সাজান, প্রাকৃত জগৎ নিয়ে নতুন ভাবে অগ্রসর হওয়া। ঠিক এই কথা বলেন মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা। তাঁদের সঙ্গে নব্য জড়বাদীদের এক জায়গায় বিশেষ মিল আছে। সেটা হল স্বাতন্ত্র্য বা আধ্যাত্মিকতার অ-তত্ত্বত্ব বা ব্যবহারমাত্রতা। প্রভেদ এই যে, নব্য-জড়বাদীরা এর অতিপ্রাকৃত 'সত্যত্ব' মানেন না, কিন্তু বর্তমান দলভুক্ত অধ্যাত্মবাদীরা এর অতিপ্রাকৃত সত্যত্ব, অর্থাৎ এর অতিপ্রাকৃতত্ব, স্বীকার করেন।

কিন্তু এঁরাও এই অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্যের 'তত্ত্বত্ব' একবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। এর 'সম্ভাব্য' তত্ত্বত্ব স্বীকার করতে এঁরা বাধ্য। একবার প্রকৃতি-রাজ্যের বাইরে দাঁড়ালে সহজেই পাদপীঠ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মায়। স্বাতন্ত্র্যরূপ আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, এ-প্রশ্ন উঠা অতি স্বাভাবিক। যে-দলের অধ্যাত্মবাদীদের কথা আমরা আলোচনা করছি তাঁরা অবশ্য বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁরা প্রকৃতির স্থূল মাটিতেই দাঁড়িয়ে আছেন। কথাটা মিথ্যা নাও হতে পারে। তাঁদের পা দুটি নিশ্চয়ই স্থূল মাটিতে, কিন্তু তাঁদের মাথাটা বা চোখ দুটো কোথায়? পা-এর সঙ্গে জোড়া যে-সমগ্র দেহটা, মাথা এবং চোখ অবশ্য সেই দেহেই রয়েছে এবং ফলে, পরম্পরাক্রমে, তারা মাটিতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পরম্পরা বললে আর একটা দিকের কথা-ও তো এসে যায়। দেহের চরণাধিষ্ঠিত একটা দিক যেমন মাটি-অভিমুখী, মস্তকাধিষ্ঠিত বিপরীত দিকটা তেমনই আকাশাভিমুখী। মাথা ও চোখ দেহ-সংযুক্ত হলেও আকাশচারী-ও বটে। এই জন্যই মহাযান-সম্প্রদায়-ভুক্ত যোগাচারীরা ব্যবহারাত্মক অতিপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য স্বীকার ক'রেও বলতে চেয়েছেন যে আকাশচারী এই অতিপ্রাকৃত ব্যবহারাত্মক স্বাতন্ত্র্য নামক বস্তুটি স্বরূপে-ও, অর্থাৎ মাটির দিকে না-তাকিয়েও, ধরা যায়। ব্যবহারাত্মক স্বাতন্ত্র্য তখন আকাশের সঙ্গে একাত্মভূত হয়ে যায়।

আকাশ যাঁদের কাছে 'শূন্য'-মাত্র তাঁরা স্থূল মাটির প্রেক্ষিতেই আকাশকে এই ভাবে দেখেন। নচেৎ, আকাশ তো স্বমহিমায় সবের ঊর্ধ্বে বর্তমান। হাল্কা মেঘেরা তো আকাশেই বিচরণ করে। বাষ্পাকারে পৃথিবী-মুক্ত হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত আকাশেই আশ্রয় নেয়। যোগাচারী বৌদ্ধেরা মেঘ বাদ দিয়ে কোন পৃথক আকাশ মানতে চান না; আকাশ, তাঁদের কাছে, মেঘেদের স্থিতি ও লীলা-মাত্র,

মেঘেদের ব্যবহার-মাত্র, কোনও পৃথক বস্তু নয়। কিন্তু আকাশের 'সম্ভাব্য' পৃথকত্ব কি তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন? স্বাতন্ত্র্যবাদী হিন্দু আকাশ-রূপ এক অতিপ্রাকৃত সদ্বস্তু মেনেছেন, যার অপর নাম অধ্যাত্ম জগৎ, যে জগৎটা অথবা ঐ জগৎস্থ নানা অতিপ্রাকৃত তত্ত্ব তাঁরা স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিতে দেখতে পান। তাঁরা যদি বলেন যে, তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন—কেবল যে দেখতে পাচ্ছেন তা নয়, তাঁরা ঐ জগৎ সম্বন্ধে কত কথাই না বলেন—তা হলে এই অতিপ্রাকৃত জগতের এবং এতৎস্থ বিভিন্ন সত্যের অন্ততঃ 'সম্ভাব্য' তত্ত্বত্ব যোগাচারী বৌদ্ধ অস্বীকার করতে পারেন না। অধ্যাত্ম জগতের এই সম্ভাব্য তত্ত্বত্ব ছায়ার মতো তাঁদের অনুসরণ ক'রে চলে।

যাবৎ হিন্দু আধ্যাত্মবাদী—বৈদিক হোক আর অবৈদিক-ই হোক—এবং অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক এই ছায়াপথ ধ'রেই তাত্ত্বিক অধ্যাত্ম-জগতে প্রবেশ লাভ করেছেন। যাঁরা ছায়াকে ছায়া-মাত্র মনে ক'রে অগ্রাহ্য করেছেন, সেই মাধ্যমিক ও যোগাচারী বৌদ্ধ নিজ নিজ মত-বাদে মশগুল থেকে কিছু অন্যায় করেন নি—এ-কথা ঠিক; কারণ ছায়া অনুসরণ করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু অপ্রয়োজনে-ও, এবং নিছক ঔৎসুক্যবশে, কেউ কেউ তো ঐ পথে যেতে পারেন। যাঁরা ঐ পথে যান তাঁরা উপনীত হন বস্তুসৎ অধ্যাত্ম-জগতে।

অদ্বৈত বেদান্তীর মতো কেউ কেউ এই অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ ক'রেই আত্মহারা হয়ে যান। আর কিছুই তাঁদের থাকে না। নির্বিশেষ বস্তুসৎ স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ আবিষ্কার ক'রেই তাঁরা আপ্তকাম হন। এই অধ্যাত্ম রাজ্যে কত রকমের বিচিত্র খেলা চলে, কেনই-বা এ-সব খেলা, পরম-তত্ত্বের এই খেলায় সঙ্গী কারা হন, এই অধ্যাত্ম জগতের সঙ্গে ফেলে-আসা প্রাকৃত জগতের কী সম্পর্ক, কেনই-বা স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ আমি প্রাকৃত জগতে গিয়ে নিজেকে প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলে বেঁধেছিলাম, কেনই-বা কিসের আকর্ষণে সে-বন্ধন ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে এলাম—ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁদের আর থাকে না। প্রশ্নগুলি যে একেবারেই উঠে না তা নয়, কিন্তু আপ্তকাম ভূমানন্দী বেদান্তী প্রশ্নগুলির সমাধানের প্রয়োজন বোধ করেন না। প্রশ্নগুলি আদৌ তাঁদের বিচলিত করে না, প্রেতলোকের ছায়ার মতো এরা তাঁদের চিন্তারাজ্যে প্রবেশের নিষ্ফল প্রয়াস করে

মাত্র। ব্রহ্মভোলা অদ্বৈতী এদের দে'খেও দেখেন না, এদের কথা শুনেও শোনেন না, এবং এ-জাতীয় ঔদাসীন্যে অভ্যস্ত হবার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁদের আধ্যাত্মিক কাণ-চোখ সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে—তাঁরা কিছুই দেখেন না, কিছুই শোনেন না—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

এঁদের বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। এঁরাও এক চরম সত্য পেয়েছেন, এবং ছায়া অগ্রাহ্য ক'রে এঁরা কোনই দোষ করেন নি। কিন্তু যাঁরা চাইবেন, এই ছায়াপথ অবলম্বন ক'রে ভিন্ন সত্যে উপনীত হব, তাঁরাও সমভাবে নির্দোষ। অদ্বৈতবৈদান্তী নিজের স্বাতন্ত্র্যস্বরূপটিকে একেবারে নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মস্বরূপ ব'লে দেখেছেন। কিন্তু অন্য বেদান্তীরা, এবং শৈব, শাক্ত ও কিছু পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ছায়ার ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে অধ্যাত্ম রাজ্যে আর-ও অনেক কিছু তত্ত্ব পেয়েছেন। কেউ কেউ এই রাজ্যে নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে-ও সহভাবী রূপে এক মহাস্বাতন্ত্র্যের, অর্থাৎ ঈশ্বরের, সন্ধান পেয়েছেন এবং এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মহাস্বাতন্ত্র্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেছেন। অনেকে আবার বলেছেন যে, মহাস্বাতন্ত্র্য প্রথমে অস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে, এবং অধ্যাত্ম রাজ্যে উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর স্তরে—সেখানেও তৎ-তৎ-স্তরীয় ছায়ার ইঙ্গিতে—অগ্রসর হয়ে মহাস্বাতন্ত্র্যটি স্ফুট থেকে স্ফুটতর রূপে পাওয়া যায়। কেউ মাঝপথে থেমে গেছেন, কেউ আরও কিছু এগিয়েছেন, ইত্যাদি। কেউই ভুল করেন নি। প্রত্যেকেই কিছু দূর এগিয়ে থেমেছেন, এবং সেখানে যে-সব ছায়া দেখেছেন, যে-কোন কারণেই হোক সেগুলি অগ্রাহ্য করেছেন।

এঁরা সকলেই কিন্তু নিছক অধ্যাত্ম রাজ্যেই তত্ত্বানুসন্ধান চালিয়েছেন। কেউ-ই পিছন ফিরে ফেলে-আসা প্রাকৃত জগতের দিকে পুনরায় তাকাবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। এমন কি, অধ্যাত্ম রাজ্যে-ও উর্ধ্বতর স্তরে উঠে নিম্নতর স্তরের দিকে আর তাকান নি, অথবা তাকিয়ে-ও যাবৎ নিম্ন স্তর নামরূপ-মাত্র ব'লে বক্তব্য শেষ করেছেন।

নিচের স্তর থেকে উপরের স্তরে উঠবার মুখে যেমন উপরের স্তরটি প্রথমে ছায়ার আকারে আসে, ঠিক তেমন-ই উপরে উঠলে নিচের স্তর-ও ছায়ার আকারে সাধকের দৃষ্টিপথে থাকে। সাধক যদি সেটা ছায়া-মাত্র ব'লে উপেক্ষা করতে চান, কোন দোষ নেই। কিন্তু এখানেও

কোন কোন উৎসাহী সাধক ছায়া-পথ ধ'রে নেমে আসতে চাইতে পারেন। যাঁরা নেমে এসে উধ্বর্তন দৃষ্টির আলোকে নিচের জগতের পুনঃ-রূপায়ন করেন তাঁরা যে আরও খাঁটি, আরও চরম সত্য পান, তা নয়, কারণ কোন চরম সত্য-ই অপর সত্যের অপেক্ষায় চরমতর বা বেশি খাঁটি নয়। যাঁরা এই ভাবে নেমে আসেন তাঁদের এইটুকু লাভ—যদিও সেটা মোটেই নগণ্য নয়—যে, তাঁরা 'পূর্ণতা' লাভ করেন।

'পূর্ণতা লাভ'-এর অর্থ পূর্ণ সত্য লাভ নয়। এটা যদি পূর্ণ সত্য হত, তাহলে অন্য যাবতীয় চরম সত্যকে অপূর্ণ বা আংশিক বলতে হত। অপূর্ণ সত্য নিশ্চয়ই পূর্ণ সত্যের অপেক্ষায় কম সত্য; এবং তাই যদি হয় তা হলে একমাত্র পূর্ণ সত্য লাভই জীবনের পরম পুরুষার্থ হওয়া উচিত ছিল। কোন সাধকেরই তা হলে অপূর্ণ সত্যে পরিতৃপ্তি হত না। অথচ, এতক্ষণ আমরা এই কথা ব'লে এসেছি যে, যে-কোন চরম সত্য লাভই পরম পুরুষার্থ। পূর্ণতা-লাভ জিনিষটা তা হলে কী? আমাদের উত্তর এই যে, এটা একটি 'বাড়তি' পুরুষার্থ, যে-পুরুষার্থ লাভে অন্য কোন পরম পুরুষার্থ লাভের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। পরম পুরুষার্থ লাভ যদি পরম আনন্দ হয়, তা হলে পূর্ণতালাভ হল একাধিক পরমানন্দে দোল-খাওয়া রূপ 'অতিরিক্ত' এক আনন্দ। বিশ্ব-দোলে দোল খেতে খেতে এই স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ সত্য একবার উধ্ব দিকে সব কটি চরম সত্য পরের পর স্পর্শ ক'রে যায়, আবার নিম্ন দিকে নামবার সময় কেবল যে সেগুলি দ্বিতীয় বার স্পর্শ করে তা নয়, অধ্যাত্ম জগতের নিচেকার প্রাকৃত জগতের প্রতিটি বিন্দু-ও স্পর্শ করে এবং সর্বনিম্নে নেমে এসে পুনরায় উধ্ব দোলে সেই বিন্দুগুলি দ্বিতীয়-বার স্পর্শ করে ও অধ্যাত্ম জগতের প্রতিটি চরম সত্যে আবার তৃতীয় বারের জন্য স্পর্শসুখ পায়। এই ভাবে নিরন্তর বিশ্বদোলে দোল খাওয়া চলে।

হেগেলীয় এবং অনেক শৈব দার্শনিক পূর্ণতাখ্যাতি মানেন। অথচ তাঁরা এই বিশ্ব 'দোলে'র কথা বলেন নি। বিশ্বগতি তাঁদের মতে মোটামুটি একমুখী সরলরৈখিক, অথবা একমুখী বৃত্তাকার; তাঁদের মতে উঠা-নামা, দোল-খাওয়া, নেই। পূর্ণতাই তাঁদের কাছে 'একমাত্র'

সত্য এবং অন্য যা-কিছু সত্যের কথা অন্য দার্শনিকেরা বলেছেন সে-সবই আংশিক সত্য অতএব, সেগুলি চরম সত্য নয়, চরম পুরুষার্থ নয়।

কয়েকটি সর্তাধীনে এই বিকল্প মত-ও গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি নেই। এই মতানুসারে অন্যান্য যাবতীয় মতবাদীয় চরম সত্যের প্রত্যেকটিই আংশিক সত্য, এ-কথা ঠিক। কিন্তু এঁরা যে-ছায়ার ইঙ্গিত-বাহিত হয়ে এই তথাকথিত পূর্ণতায় উপনীত হয়েছেন, অন্যমতাবলম্বীরা সেই ছায়া অগ্রাহ্য ক'রে তো কোন অন্যায় করে নি। কাজেই তাঁরা যে-সব সত্য লাভ করেছেন তাদের প্রত্যেকটিরই চরম সত্য হতেও বাধা কোথায়? ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, সেই মতবাদগুলির মতো এই মত-ও অন্যতম একটি বিকল্প। কেউ-ই দাবি করতে পারেন না যে, তাঁর মত অন্য সব মতের চেয়ে প্রশস্ততর।

দ্বিতীয়তঃ, এই পূর্ণতাখ্যাতির অর্থ যদি সব সত্যের সমাহার-মাত্র হয় তাহলে তো বিষম বিপত্তি ঘটে। চরম সত্যের অনেকগুলি তো তো পরস্পরবিরুদ্ধ। এদের সমাহারস্বরূপ মহাসত্য কী করে সম্ভব হয়? পরস্পরবিরুদ্ধ সত্য তো একে অন্যের বিনাশক।

এই জন্যই যাবৎ পূর্ণতাখ্যাতিবাদী কোন-না-কোন প্রকার 'ডায়ালেকটিক' মানতে বাধ্য হয়েছেন। 'ডায়ালেকটিক' মেনে নিলে অবশ্যই একজাতীয় সমন্বয়ে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু সব-জাতীয় 'ডায়ালেকটিকে'র চারিধারে ছায়ার মতো এক অসামঞ্জস্য-ও পীড়া দিতে থাকে। বিচার্য পূর্ণতাখ্যাতিবাদ এই ছায়া অবজ্ঞা করতে পারে, যেমন অনেকেই ছায়ার হাতছানির প্রতি বিমুখ। কিন্তু যদি কেউ ঐ ছায়ার ইঙ্গিত ধ'রে এগিয়ে যেতে চায়, তাকেও বাধা দেওয়া অন্যায় হয়। বরং 'ডায়ালেকটিকে'র প্রাণধর্মের খাতিরে তাকে উৎসাহ-ই দেওয়া উচিত। অতএব, এই পথে অগ্রসর হয়ে কেউ যদি নতুন কোন তত্ত্বে পৌঁছায়, তা হলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না কেন?

এই পথে যে নতুন তত্ত্ব পাওয়া যায় তা হল বিশ্বদোলে দোল। বিশেষ এই যে, বিভিন্ন চরম-সত্য-পন্থী যেখানে প্রত্যেকে অপর মতের প্রতি বিদ্বেষী বা অন্ধ-উপেক্ষা-প্রদর্শী, এবং যেখানে তথাকথিত পূর্ণতাখ্যাতিবাদী অন্য সব মত কুক্ষীগত করতে চান, সে-ক্ষেত্রে এই বিশ্ব-

দোল-বাদীর কাছে প্রতিটি মত সমভাবে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে। তিনি বলেন সব মৌলিক মতবাদই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে। কেবল গ্রহণ'যোগ্য' বলে মৌখিক আপ্যায়ন জানালে চলবে না।

বিকল্পভূত বিশ্বমতের এই প্রকৃতগ্রহণ (স্বীকৃতগ্রহণ) কিন্তু প্রতিটি মৌলিক মতবাদের প্রকৃত-গ্রহণের সমপর্যায়ী নয়। দোল-খাওয়া ব্যাপারটাই অভিনব। যে ভ্রমর এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে বেড়ায় সে ফুল জাতির সমগোত্রীয় নয়। সে ভিন্ন রাজ্যের জীব, যদিও সব ফুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি মধুর। আবার, ফুলের জগৎ এবং ভ্রমর-জগৎ যেমন একই প্রকৃতি-রাজ্যের বিভিন্ন স্তর, ঠিক তেমনই কথা বিভিন্ন চরম সত্য ও বিশ্বদোলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশ্বদোল চরম-সত্য-রাজ্যের নিগূঢ় মাত্রা (dimension)-বিশেষ।